Banglapdf.net Exclusive

সাদত হাসান মান্টো

roni060007

সা'দত হাসান মান্টো

কোকোজান

অনুবাদঃ এ. বি. এম. কামালউদ্দীন শামীম

৩৮/বাংলাবাজার/ঢাকা

প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৮০

মূল্য : ১০'০০ টাকা

প্রকাশনায় : দেওয়ান আবদুল কাদের ॥ ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে : সোসাইটি প্রিন্টার্স ॥ ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ-শিল্পী : প্রাণেশ কুমার মণ্ডল

ইশরাত জাহান আলেয়া

তনিমা তাসনিম তিতু

অপরিমিত আশীর্বাদসহ
তোমাদের হাতে
তুলে দিচ্ছি

অনুবাদকের কথা

১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে সা'দত হাসান মান্টো 'কালো শেলোয়ার' গল্প লেখার কারণে অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে করাচীর আদালতে উপস্থিত হন এবং পঁচিশ টাকা জরিমানা দিয়ে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। সেদিন বিকেলে করাচীর 'মেরিনা হোটেল'-এ আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "হে খোদা, হে রব্বুল আলামীন, তুমি সা'দত হাসান মান্টোকে এ পৃথিবী থেকে তুলে নাও। আলোর মধ্যে যে চোখ মেলে না, কিন্তু অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। লজ্জার আবরণীর প্রতি তার কোন কৌতূহল নেই, সে দেখে মানুষের নগ্নতা। গৃহবধূদের প্রতি সে চোখ তুলেও চায় না, কিন্তু পতিতা বেশ্যাদের সঙ্গে সে মন খুলে কথা বলে। যেখানে কান্না সেখানে সে হাসে, যেখানে হাসি সেখানে সে কাঁদে। কয়লার দালালী করে যারা নিজেদের মুখ কালিমালিপ্ত করে সে তাদের কালিমা দূর করে স্বচ্ছ চেহারা সবাইকে দেখায়। এ ধরনের দুষ্কৃতিকারী, অপ্রিয়ভাজন ব্যক্তিকে তুমি ভুলে নাও, কারণ সে এ পৃথিবীর অসৎস্বভাব দুর্বৃত্তদের আমলনামার কালিমা মুছে ফেলার কাজে লিপ্ত রয়েছে।"

উপরোক্ত বক্তৃতাংশে মান্টো মূলত তাঁর রচিত সাহিত্যের আদর্শ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি পোড়খাওয়া অশান্ত মানব-প্রেমিক। সক্রেটিস বিষপানের সময়ে ধীরস্থির এবং শান্ত-সমাহিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর গুণগ্রাহীরা আকুল কান্নায় ভেঙ্গে

পড়েছিল। মাণ্টোও বিষপানের পূর্বক্ষণে সম্পূর্ণ শান্ত অচঞ্চল ছিলেন, কিন্তু তাঁর মানসিক যন্ত্রণা ছিল অপরিসীম। বাহ্যত শান্তভাব বজায় রেখে তিনি নিজের নিষ্পাপ সন্তানদের প্রতিদিনের মতো সাজপোষাক পরিয়ে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর কাছে কাউকে আসতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং নিভৃত গৃহকোণে এক সময় মৃত্যুর হীমশীতল কোলে ঢলে পড়েছিলেন।

মাটি ও মানুষকে ভালোবেসে যেসব কবি-সাহিত্যিক লেখনী ধারণ করেন, মৃত্যুর পরও মানুষ তাঁদের ভুলতে পারে না! উর্দু সাহিত্যের বিস্ময়কর প্রতিভা সা'দত হাসান মাণ্টোকেও লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকা ভুলতে পারেনি, কোনদিন পারবেও না। তাঁর গল্প লেখার কৌশল, বর্ণনার সাবলীলতা, চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্যহেতু প্রতিটি গল্প পাঠ করেই মনে হয়, 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'।

'কোকোজান' গল্প সংকলনের প্রতিটি গল্প মাণ্টোর অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের মাণ্টো-প্রীতি আরো বাড়িয়ে দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১০/৫/৮০ ইং

—অনুবাদক

সূচীপত্র

কোকোজান	৯
সৌন্দর্যের সৃষ্টি	২১
চোখ	২৭
যাও হানিফ, যাও	৩৩
বাচনি	৪১
ফসফসি কাহিনী	৪৮
মাহমুদা	৫৮
আল্লাদতা	৬৭
বিয়ে	৭৬
নলখাগড়ার পেছনে	৮৯

পড়ার মতো কয়েকটি অনুবাদ বই

ডার্লিং ডার্লিং ডার্লিং
দু'টি উদাস চোখ
চাঁদ, হে চাঁদ
ফুলে ফুলে খুঁজে ফেরে
ভগবানের সাথে কিছুক্ষণ
এবং আলো এবং আঁধার
রক্তের মত লাল
প্রেমেশ্বরী
নির্মলা
মাটির প্রেম
এজেণ্ট এফ. বি. আই
বাবু গোপীনাথ
হংকং-এ একরাত
নির্বাচিত আরবী গল্প
লাভ স্টোরি
এক লায়লা হাজার মজনু
শহীদ
দরোজা খুলে দাও
সেই মেয়েটি
প্রথম স্ত্রী
শয়তানের পদত্যাগ
পাঁচ গুণ্ডা এক নায়িকা
সুন্দর পৃথিবী
দু'ফোঁটা পানি
মাণ্টোর অপ্রকাশিত গল্প
স্বর্গের শেষ ধাপ
আর পাবো না ফিরে
নগ্ন আওয়াজ
প্রেমের নাম বেদনা
এস মরি
প্রেম আমার প্রেম
কোকোজান
আখেরী স্যালুট
লতিকা রাণী
ইণ্ডিয়ান কলগার্ল
ববি
তিন গুণ্ডা

কোকোজান

প্রথমদিনের আলাপ পরিচয়েই শাহ সাহেব অন্তরঙ্গ পরিবেশ গড়ে তুললেন। আমি শুধু এটুকু জেনেছিলাম যে তিনি সৈয়দ এবং আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কি করে যে তিনি আমার নিকট বা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় সে সম্পর্কে আমি কিছু জানতাম না। তিনি সৈয়দ, আমি কাশ্মিরী, ব্যস!

সে যাই হোক তাঁর সাথে আমার অসঙ্কোচ ভাব বেড়ে চলল। আদব কায়দার ব্যাপারে খুঁত খুঁত করার মেনিয়া তাঁর নেই। তিনি যখন শুনলেন যে, আমি গল্প লিখি, তখন আমার কাছ থেকে কয়েকটি বই চেয়ে নিয়ে পড়লেন। আমি অবাক হলাম যে, কয়েকটি গল্পের তিনি খুব প্রশংসা করলেন। ঘটনাক্রমে সে গল্পগুলো সাহিত্য জগতে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলে সমাদৃত হয়েছিল।

শাহ সাহেব ছিলেন আমার প্রতিবেশী। একটা ঘর তিনি এলট করে রেখেছিলেন। কিন্তু পরিবারের লোকসংখ্যা বেশী হওয়ায় ফ্ল্যাটের নীচের মোটর গ্যারেজও তিনি অধিকার করেছিলেন। উপরে মেয়েরা থাকতেন। শাহ সাহেবের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা ছিল অনেক, গ্যারেজের বৈঠকখানায় তিনি তাদের আপ্যায়ন করতেন।

একদিন গল্প সম্পর্কে তার সঙ্গে আলাপ হলে তিনি বললেন, 'আমার জীবনে এমনকিছু বাস্তব ঘটনা রয়েছে যেগুলোকে আপনি গল্পাকারে রূপ দিতে পারেন। আমি সব সময় গল্পের মাল-মশলা খুঁজে বেড়াই, এজন্য শাহ সাহেবের কথায়, মনোযোগী হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বললাম—আপনি ভাল মাল-মশলা দেবেন বলেই আমি আশা করি।'

শাহ সাহেব জবাবে বললেন, 'আমি গল্পকার নই, কিন্তু আমার জীবনে এমন ঘটনা রয়েছে যা কিনা উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য বললাম এজন্য, কারণ আপনি একজন উঁচুদরের গল্প লেখক। তা না হলে আমি যে ঘটনা বর্ণনা করব এ ঘটনাকে বলা যায় অত্যন্ত বিস্ময়কর।

শাহ সাহেব বললেন, 'আমি তা কি আর বলব, তবে যে ঘটনা শোনাতে যাচ্ছি সে ঘটনা প্রত্যেকেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করবে। আমি শুধু নিজের প্রতিক্রিয়াই আপনাকে জানাবো, তবে এটা ঠিক যে ঘটনা আপনাকে শোনাবো, এটা এ যাবত সংঘটিত আমার জীবনের ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর।

'নেইল কাটার' দিয়ে শাহ সাহেব নখ কাটতে শুরু করলেন। আমি তার কাহিনী শোনার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সম্ভবত কাহিনী কিভাবে এবং কোথা থেকে শুরু করবেন সেটাই ভাবছিলেন। আমার এ ধারণা মিথ্যা ছিল না। বহু বছর আগের ঘটনা হেতু শাহ সাহেব ঘটনার সূচনা-পর্ব নিজের মনে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিচ্ছিলেন।

আমি সিগারেট ধরালাম। শাহ সাহেব দশ আঙ্গুলের নখ কেটে টেবিলের ওপর রেখে আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি কাবুলে ছিলাম।' এই বলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'সেখানে আমার বেশ বড় একটা দোকান ছিল, সে দোকানে মূল্যবান সব জিনিসপত্র মওজুদ রাখতাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি জেনারেল মার্চেন্ট ?'

শাহ সাহেব জবাব দিলেন, 'জী, হাঁ, কাবুলের সবচেয়ে বড় জেনারেল মার্চেন্ট। আমার দোকানে কাবুলের প্রায় সব মেয়েরা সওদা করতে আসতো। আপনাকে একটা কথা বলছি। পাশের দোকানী যদি আমার দোকানে কোনদিন শুধু পুরুষ ক্রেতা দেখতো তাহলে ফার্সী ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করে বলতো—আগা, আজ একি হলো, কাবুলের মহিলারা আর মেয়েরা কি মরে গেছে ? নাকি তোমার নসিব ঘুমিয়ে পড়েছে ?'

শাহ সাহেব হেসে ফেললেন। এ ছাড়া তিনি কি আর জবাব দিতে পারতেন। তবে তার দোকানে অধিকাংশ যে মহিলা এবং তন্বী তরুণী ক্রেতা আসতো, এ সম্পর্কে তিনি নিজেও অবহিত ছিলেন। তার বাক-চাতুরীই যে এর মূল কারণ এটাও তার অজানা ছিল না।

তিনি আমাকে বললেন, 'মাল্টো সাহেব, আমি একজন উৎকৃষ্ট সেলস-ম্যান, বিশেষত মেয়েদের সাথে কেনাকাটা করার ব্যাপারে আমি এমন

চমৎকার নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে জানি যে, এখানে লাহোরে আমার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। বি. এ. পাশ করেছি। অল্প স্বল্প সাইকোলজিও পড়েছি, এ জন্য মেয়েদের কি ভাবে পটাতে হয় কি ভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সে সব আমার ভালই জানা আছে। এ কারণেই সমগ্র কাবুলে শুধু আমার দোকানেই এমন কোন সময় যেতো না যখন কোন ক্রেতাই থাকতো না।

শাহ সাহেবের এ আত্মপ্রশংসা শুনে আমি বললাম, 'নিঃসন্দেহে আপনি উৎকৃষ্ট সেলস্‌ম্যান। আপনার কথা বলার স্টাইলও তার প্রমাণ দিচ্ছে।'

শাহ সাহেব হেসে বললেন, 'কিন্তু দুঃখ হলো। আমি উৎকৃষ্ট সেলস্‌ম্যান হিসেবে নিজের কাহিনী বর্ণনা করতে সক্ষম হবো না।'

আমি বললাম, 'আপনি শুরু করুন।'

শাহ সাহেব আবার কিছুক্ষণের জন্য স্মৃতির রাজ্যে হারিয়ে গিয়ে কাহিনী শোনাতে শুরু করলেন। বললেন, 'আপনাকে আগেই বলেছি যে, আমি কাবুলে ছিলাম। এটা এখন থেকে প্রায় দশ বছর আগের কথা। আমার স্বাস্থ্য ছিল তখন অত্যন্ত ভালো। এমনিতে আমাকে এখনো সুদেহী পুরুষ বলা হয় কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় আমার স্বাস্থ্য ছিল বর্তমানের দ্বিগুণ। প্রতিদিন খেলাধুলা করতাম, নানা রকমের ব্যায়াম করতাম, সিগারেট মদ ছুঁতাম না, তবে ভাল ভাল খাবার খাওয়ার অভ্যাস ছিলো। আমি আফগান নই, ভারতীয়। এজন্য ভারতের অমৃতসর থেকে একজন নামকরা কাশ্মিরী বাবুর্চি নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই বাবুর্চি প্রতিদিন আমার জন্য সুস্বাদু খাবার তৈরী করে টেবিলে সাজিয়ে রাখতো। বড় সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনের দিনগুলো কাটছিল। ব্যাঙ্কে লাখ লাখ আফগানী মুদ্রা সঞ্চিত হচ্ছিল, কিন্তু—'

শাহ সাহেব কিছুক্ষণের জন্য আবার নীরব হয়ে গেলেন। আমি তাকে বললাম, 'কিন্তু বলে আপনি নীরব হয়ে গেলেন, এর কি এই অর্থ দাঁড়ায় না যে, এতদসত্ত্বেও আপনি ছিলেন অসুখী?'

শাহ সাহেব স্বীকার করলেন। বললেন, 'জী, হাঁ, এতো স্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও আমি অসুখী ছিলাম। কারণ আমি ছিলাম তখন একাকী, অবিবাহিত।

যদি আমার দোকানে মহিলা এবং যুবতী মেয়েরা না আসতো তবে সম্ভবত আমার একাকীত্বের অনুভূতি প্রকাশ পেতো না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল এর বিপরীত। কাবুলের সব বিত্তবান মেয়েরা আমার দোকানে আসতো। দোকানে প্রবেশ করেই এসব মেয়েরা নিজ নিজ বোরখা খুলে এক পাশে রেখে দিত এবং কেনাকাটায় মনোনিবেশ করতো। মাস্টো সাহেব, আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে, তারা শরীয়তের বিধি সম্মত পোশাক পরিধান করতো কিন্তু আসলে তা নয়। কিন্তু এখানের মেয়েরা পর্দা করলেও ইউরোপীয় কায়দায় পোশাক পরিধান করে। ছোট করে চুল ছাটা, রঙ্গিন নখ, পায়ের অনেকটা নগ্ন। দোকানে এসে বোরখা খুলে রেখে তারা জিনিসপত্র পছন্দ করতো।

শাহ সাহেব আবার চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, 'আপনি নিশ্চই তাদের কাউকে ভালবেসে ফেলেছেন।

শাহ সাহেব সায় দিয়ে ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন, 'জী, হাঁ, একটা মেয়েকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম, মেয়েটি দোকানে প্রবেশ করেও বোরখা খুলতো না, এমন কি চেহারার নেকাবও তুলতো না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে ছিল সে?'

তিনি বললেন, 'সে ছিল এক অভিজাত পরিবারের মেয়ে। তার পিতা ছিলেন সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসার। মেয়েটি হাতের কব্জি ছাড়া দেহের অন্য কোন অংশ প্রদর্শন করতো না, এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক বৈশিষ্টের কারণেই আমি তাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এর কারণ?'

শাহ সাহেব বললেন, 'আমি জানি না। এ ব্যাপারে তাকে কখনো জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু আমার ধারণায় সে ছিল অনিন্দ-সুন্দরী। গৌর-বর্ণা। সারাদেহ বোরখায় আবৃত থাকলেও দেহের গঠন বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা করা কষ্টকর ছিল না। আমি চোরা-চোখে দেখেছিলাম, সে ছিল যৌবনের আদর্শ সমন্বয়। কিন্তু মুশকিল হলো, সে কয়েক মিনিটের জন্য আমার দোকানে আসতো, জিনিসপত্র পছন্দ এবং দাম-দস্তুর করতে কয়েক মিনিট সময় ব্যয় করে চলে যেতো।'

আমি শাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ অবস্থা কতোদিন চলেছিল ?'

'প্রায় ছ'মাস। তার প্রতি আমার ভালবাসার কথা জানানোর সাহসই আমি পাচ্ছিলাম না। তার ব্যক্তিত্বে আমি খুবই প্রভাবিত ছিলাম, কারণ সে ছিল অন্য সবার চাইতে পৃথক। তার মধ্যে আশ্চর্য রকমের শালীনতা বোধ ছিল। আমি তার প্রতি অনিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকতাম, অথচ এটা শোভন নয়। কিন্তু আমি নিজের হৃদয়ের হাতে বাধ্য ছিলাম। মাণ্টো সাহেব, একদিন দোকানে বসে তার সম্পর্কে ভাবছিলাম, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। চাকর টেলিফোনের রিসিভার তুলে আমাকে জানাল, একজন মহিলা আপনার সাথে কথা বলতে চান। আমি ভাবলাম কোন ক্রেতা হবে, নতুন মালামাল সম্পর্কে খোঁজখবর জানতে চায়। আমি উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে বললাম—ম্যাডাম, আপনি কি চান ? ওপাশ থেকে স্বর ভেসে এলো—আপনি কি সৈয়দ মুজাফফর আলী ? আমি জবাব দিলাম—জী, হাঁ বলুন। আমি ততক্ষণে কণ্ঠস্বর চিনে ফেলেছিলাম, সেই মেয়েই কথা বলছে, যে কিনা আমার দোকানে এসে বোরখা খোলে না। আমি ঘাবড়ে গেলাম। মাণ্টো সাহেব, প্রেমিক হওয়াও এক অদ্ভুত অভিশাপ।'

আমি হেসে বললাম, 'আপনি ঠিকই বলছেন, শাহ সাহেব, কিন্তু আমি এ অভিশাপে এখনো জড়িয়ে পড়িনি, বড় আফসোসের ব্যাপার।

শাহ সাহেব দুঃখ করে বললেন, 'সর্বনেশে ব্যাপার দেখছি। যে কোন মানুষ যৌবনে একবার না একবার অবশ্যই প্রেমের হাতে বন্দী হয়। সে যাক, যদি এখনো প্রেম না করেন তবে খোদা করুন, তাড়াতাড়ি যেন প্রেমে জড়িয়ে পড়েন এই কামনা করি, কারণ এটা বেশ মজার রোগ।'

আমি হেসে শাহ সাহেবকে বললাম, 'আপনি নিজের কাহিনী বর্ণনা করুন। যদি আমি প্রেমে জড়িয়ে পড়ি তবে তার পূর্ণ রোয়েদাদ আপনাকে শোনাবো কথা দিচ্ছি।'

শাহ সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে পালঙ্কে শুয়ে পড়লেন এবং চোখ বন্ধ করে বললেন, 'মাণ্টো সাহেব, আমি সে মেয়ের সাথে এমন বিশ্রীভাবে জড়িয়ে গেলাম যে খেলাধুলা ব্যায়াম ভুলে গেলাম। আমার দোকানে সে

প্রায়ই আসতো। আমি তার প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। কিন্তু দেখুন, আমার মাথা কিরকম খারাপ হয়ে গেছে, এটাও সেই প্রেমেরই ফলশ্রুতি। আপনার সাথে আমি তার টেলিফোন করা নিয়ে কথা বলছিলাম। আমি রিসিভার তুলে তার কণ্ঠস্বর চিনে ফেলার পর সে বলল, 'দেখো, আমি তোমার দোকানে যাই, তুমি আমার প্রতি পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাক। যদি ভাল চাও তবে ঠিক হয়ে যাও। অন্যথায় তোমার পরিণাম খুব খারাপ হবে। মাল্টো সাহেব, আমি কি জবাব দেব ভাবছিলাম, এমন সময় সে টেলিফোন রেখে দিল। দীর্ঘ সময় আমি নীরব টেলিফোন কানে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং ভাবতে লাগলাম, এ হুমকির অর্থ কি হতে পারে?'

আমি শাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ হুমকি কি প্রকৃতই হুমকি ছিল?'

'জী, হাঁ, চতুর্থ দিন সে আমার দোকানে এলে আমি আগের মতোই তার নেকাব ঢাকা চেহারার প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। সে অত্যন্ত বিরক্তির সাথে বলল—তোমার লজ্জা হয় না, তুমি যে আমাকে এভাবে দেখো? কর্মচারীদের সামনেই এ কথা বলায় আমি যেন বিমূঢ় হয়ে গেলাম। সে কয়েকটি জিনিস পছন্দ করলো, দাম করলো এবং দাম পরিশোধ করে নিজের মোটর গাড়ীতে বসে চলে গেল।'

শাহ সাহেবের কাহিনীতে আমি চমৎকৃত হচ্ছিলাম। বললাম, 'আজব মেয়ে তো। আপনাকে সে ঘৃণা করতো, তা সত্ত্বেও আপনার দোকানে আসতো?'

শাহ সাহেব বললেন, 'হাঁ, তাই।' কিছুক্ষণ নীরবতার পর শাহ সাহেব বললেন, 'এ সময়ে আমি আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত সরদার বেলোনাত সিং মজিঠিয়ার কাছে সব খুলে বললাম, তিনি মাঝে মধ্যে টাকা ধার নিতেন। তিনি উৎসাহ ভরে বললেন—শাহ সাহেব, আগে হুইস্কির ব্যবস্থা করুন। আমি তাই করলাম। তারপর তিনি আমাকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে সাত রং-এর সাতটা বনফুলে মন্ত্র আরোপ করে সেই মেয়েটিকে যে করে হোক ঘ্রাণ নেয়াতে বললেন।'

—মন্ত্র ?

—জী, হাঁ।

—আপনি সৈয়দ, আপনি কি মন্ত্রে বিশ্বাস করতে পারেন ?

শাহ সাহেব বললেন, 'বিশ্বাস করা তো উচিত নয়। আমাদের ধর্মে এ বিশ্বাসের অনুমোদন নেই। কিন্তু তখন সর্দার বেলোনাত সিং-এর পরামর্শ না শুনে উপায় ছিল না, কারণ প্রেম একটা বিশ্রী রোগ ছাড়া কিছুই নয়। সরদার বেলোনাত সিং আমাকে মন্ত্র শিখিয়ে বললেন, সাত রঙের সাতটা ফুলে আলাদা ভাবে এ মন্ত্র আরোপ করবেন এবং কোন এক মঙ্গলবারে যে করে হোক সেই মেয়েকে দিয়ে ঘ্রাণ নেয়াবেন। সে মন্ত্র এখনো আমার মনে আছে।'

—একটু শোনান তো।

শাহ সাহেব নিজের স্মৃতি শক্তির ওপর জোর দিয়ে বললেন :

কোরো দশ সুখিয়া দেবী,
ফুল খুড়ে ফুল হাস্‌সে
ফুল চুগে নাহের সিং পেয়ারে
যো কোই লে ফুলকি বাস্‌
কভি না ছোড়ে হামরা সাথ
হাম ছোড় কেসি আওর কো করে
পেঁ ফুল ভস্‌ম হো মরে
দোহাই সোলায়মান পীর পয়গম্বর কি !

এ মন্ত্র শোনার পর শৈশবের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। আমি তখন মন্ত্র সম্বলিত একটা বই কিনেছিলাম, একটা মন্ত্র সম্পর্কে লেখা ছিল যদি এ মন্ত্র পাঠ করা হয় তাহলে স্কুলের সব পরীক্ষায় পাশ অবধারিত। সে মন্ত্র এখনো আমার মনে আছে—উংনুসা কামশিরি উতমা দে ভেরেঙ পারা সুয়াহ।—কিন্তু এ মন্ত্র পাঠের ফল এই হলো যে আমি নবম শ্রেণীতে ফেল করলাম।

আমি শাহ সাহেবের কাছে সে মন্ত্রের উল্লেখ না করে বললাম, 'আপনি সাত রঙের ফুলের সে মন্ত্র পাঠ করলেন ?'

'জী, হাঁ, আমি সোমবার সাত রঙের ফুল একত্রিত করলাম, তার ওপর মন্ত্র পাঠ করলাম এবং মেয়েটিকে টেলিফোন করলাম যে আমার দোকানে চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে অনেক মালামাল এসেছে, খুব ভাল মাল, মঙ্গলবারে তিনি এসে যেন দেখে যান।

—সে এলো ?

—জী, হাঁ। এসেছিলো। টেলিফোনে আমাকে জানাল যে, সে আসবে। বিকেল পাঁচটার দিকে আমি তার প্রতীক্ষা করছিলাম, ঠিক পাঁচটা পাঁচ মিনিটে সে এসে হাজির হলো। এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার মালামাল দেখতে চাইলো। আসলে চেকোশ্লোভাকিয়ার মালামালের কাহিনীতে কোন সত্যতা ছিল না, আমি তাকে বললাম- কর্মচারীরা এখনো পেটি খোলেনি, আগামীকাল আসুন। সে খুব বিরক্ত হলো। আমি ফুলের প্রতি তাকালাম। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেও ফুলের প্রতি তাকালো এবং আমাকে বলল তোমার টেবিলে এ ফুল এলো কোত্থেকে? আমি জবাব দিলাম—আপনার জন্য ক্রয় করেছি। যদি আপনার পছন্দ হয় অর্থাৎ কিনা যদি এর খুশবু আপনার পছন্দ হয় তবে আপনি গ্রহণ করতে পারেন। সে সাতটি ফুল হাতে তুলে ঘ্রাণ নিল।

—তার প্রতিক্রিয়া কি হলো?

—নাসিকা কুঞ্চিত করে বলল—এগুলো ফুল? এতে তো দেখছি সুগন্ধ দুর্গন্ধ কিছু নেই। যাই হোক সে ফুলের ঘ্রাণ নিল, কয়েকটি জিনিস ক্রয় করল এবং চলে গেল। সন্ধ্যায় বেলোনাত সিং মজিঠিয়া আমার দোকানে এলেন। এসে জিজ্ঞেস করলেন—মেয়েটি ফুলের ঘ্রাণ নিয়েছে কিনা। আমি বললাম—শুঁকিয়ে তো দিয়েছি, কিন্তু এর পরিণাম কি দাঁড়াবে সে আমি জানি না। সরদার বেলোনাত হাসলেন। সজোরে আমার হাত চেপে ধরে বললেন —দোস্ত, এবার তোমার কাজ পনের আনা হয়ে গেছে।

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, মন্ত্রের দ্বারা এ ধরনের কাজ পনের আনা হয় কি ভাবে? কিন্তু সৈয়দ সাহেব বলতে শুরু করলেন, 'মান্টো সাহেব, বিশ্বাস করুন, আমার কাজ পনের আনাই হয়ে গেছে। পরদিন কোকোজান টেলিফোন করল, সে কিছু জিনিস ক্রয় করতে আসছে। আমি তাকে স্বাগত

জানালাম। দোকানে এসে সে কোন জিনিস ক্রয় করতে চাচ্ছিল না। দীর্ঘক্ষণ দোকানের এদিক ওদিক পায়চারি করল, তারপর আমাকে বলল—তোমাকে কতবার বলেছি, আমার প্রতি এভাবে তাকিয়ো না। আর তুমি আমাকে যে ফুল শুঁকিয়েছ তার উদ্দেশ্য কি?

আমি জড়িয়ে যাওয়া স্বরে কোকোজানকে বললাম, 'আমি—আমি সেই ফুল—সেই—আমি—আমি—চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে মালামাল এসেছিল, সেগুলো খোলা হয়নি, এজন্য সে ফুল আপনাকে দিয়েছিলাম। কোকোজানকে বোরখার ভেতর খুবই অস্থির দেখাচ্ছিল। সে অস্থির কণ্ঠে জানতে চাইল—তুমি আমাকে ফুল শুঁকিয়েছ কেন? আমি সরলভাবে বললাম—এতে কি আপনার কোন কষ্ট হয়েছে? সে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, কষ্ট? সারা রাত আমি সেই ফুল দেখেছি। ফুল আসছে, ফুল যাচ্ছে। আমি নিতে যাচ্ছি, পারছি না, দূরে সরে যাচ্ছে। এ কেমন ফুল? আমি জবাব দিলাম—আমাদের দেশের ফুল—আমাদের দেশের ফুল এজন্যই আপনার সামনে দিয়েছিলাম, কিন্তু সে ফুল সারারাত আপনি কেন দেখবেন এবং আপনাকে কেন বিরক্ত করলো ভেবে অবাক হচ্ছি!'

শাহ্ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ফুল আনিয়েছিলেন কোথা থেকে?'

শাহ সাহেব বললেন, 'কোথা থেকে আনিয়েছি? সেই আফগানিস্তান থেকেই সংগ্রহ করেছি। নেহায়েত বাজে ধরনের ফুল, নামমাত্র সুগন্ধিও নেই। বিকেলে সরদার বেলোনাত সিং আরো কিছু টাকা নিতে এলেন। ধার চাওয়ার আগে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—বলুন শাহ সাহেব, সে ব্যাপারের কি হয়েছে? আমি তাকে সব খুলে বললাম। তিনি ধারের কথা ভুলে গেলেন, নিজের মাংসল লোম-ভরা হাত আমার কাঁধে রেখে উচ্চস্বরে বললেন—শাহজী, আপনার কাজ ষোল আনা হয়ে গেছে। এক বোতল হুইস্কির ব্যবস্থা করুন।

শাহ সাহেব আমাকে জানালেন যে, তিনি হুইস্কির বোতল ছাড়া এক প্যাকেট সিগারেটও আনালেন। সরদার বেলোনাত সিং মজিঠিয়া তা থেকে কড়া ধুমপায়ীর মত একটার পর একটা সিগারেট ধরাতে লাগলেন। চলে যাওয়ার সময় বললেন—দেখুন, এখনো কিছুটা কাজ বাকি আছে।

আগামী মঙ্গলবারে আরো সাতটা ফুল এনে মন্ত্র পাঠ করে মেয়েটিকে শুঁকিয়ে দেবেন। দেখবেন, উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেছে।

শাহ্ সাহেব ভেবে পেলেন না কোকোজানকে আবার কি করে ফুল শুঁকতে দেবেন। সে তো সন্দেহ প্রকাশ করে ফেলেছে। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে শাহ সাহেব মৃত্যুর মুখে যেতেও প্রস্তুত ছিলেন।

শাহ সাহেব পেশোয়ার থেকে ফুল আনালেন। তা থেকে সাতটা বেছে নিলেন। দোকানের ফুলদানিতে সে ফুল সাজিয়ে রাখলেন।

মঙ্গলবার কোকোজানকে টেলিফোন করলেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার মালামালের পেটি খোলা হয়েছে, আপনি এসে দেখে যান। কোকোজান এলো। শাহ সাহেব বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার চাকর বাকরদের ধমকাতে শুরু করলেন, 'তোমরা এখনো কেন পেটি খুললে না?'

কোকোজানের সাথে তার মা বুবুজানও এলো। তিনি এক পাশে টয়লেটের দ্রব্যাদি দেখতে লাগলেন। কোকোজান ফুলদানির প্রতি তাকিয়ে বিস্মিত হওয়ার সাথে সাথে উদ্বিগ্নও হলো।

আমার টেবিলের ওপর সেই বিশেষ ফুল সাজানো। সে ধীর পায়ে ফুলের কাছে এলো। ফুলদানি থেকে ফুল তুলে ঘ্রাণ নিল এবং আমাকে বলল—এ ফুল আফগানিস্তানের নয়।

আমি বললাম—জী, হাঁ, এ আমার দেশের ফুল। আমি আপনার জন্য বিশেষ ভাবে আনিয়েছি। বুবুজান কেনা কাটায় ব্যস্ত। এ সময়ে কোকোজানের প্রতি আমার বুক ভরা ভালবাসার কথা প্রকাশ করলাম! সে খুবই বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হলো। কিছুক্ষণ পর তার মায়ের সাথে চলে গেল। সন্ধ্যায় সরদার বেলোনাত সিং মজিঠিয়া এলেন। আমি তাকে দশ টাকা ধার দিলাম। টাকা পকেটে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আজ তো মঙ্গলবার, ফুল শুঁকিয়েছেন? আমি সব কথা তাকে খুলে বললাম। সর্দার বেলোনাত সিং ভরা মাংসল হাতে আমার হাত চেপে বললেন—এবার কাজ সতেরো আনা হয়ে গেছে। এক বোতল হুইস্কির ব্যবস্থা করুন।

শাহ সাহেব হুইস্কির ব্যবস্থা করলেন। সরদার বেলোনাত সিং

মজিঠিয়া অর্ধেক দোকানে বসে পান করলেন এবং বাকী অর্ধেক সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আমি শাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, দ্বিতীয়বার ফুল শুঁকিয়ে কি ফল পেলেন ?'

শাহ সাহেব বললেন, 'সে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ল। রাতদিন শুধু ফুল দেখতে পায়। একদিন ভয়ানক অস্থিরতার সাথে দোকানে এলো। যে বোরখা সে কখনো খোলেনি, সেদিন সে দোকানে এসেই কলার খোসার মত তা ছুঁড়ে ফেলল এবং আমাকে বলল—দেখো শাহ, তুমি আমার ওপরে কোন যাদু করেছ। আমি সেই প্রথমবার তার চেহারার প্রতি তাকালাম। মান্টো সাহেব, আমি সারা জীবনে অমন রূপসী মেয়ে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। আমি তাকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তখন লাগলাম। সে ক্রুর স্বরে বলল, তুমি কেন আমাকে ফুল শুঁকিয়েছ? আমি তো এখন পাগল হতে চলেছি। দিনরাত সব সময় তোমার সেই ফুল দেখতে পাই। আমি জানি, তুমি আমাকে ভালোবাসো। কিন্তু তোমার জানা উচিত, আমি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। আব্বা-আম্মা শীঘ্রই আমার বিয়ে দেবেন। তুমি আমার ওপর একি যাদু করেছ? এই বলে সে টেবিলের ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে মেঝেতে ফেলে স্যাণ্ডেল দিয়ে পিষে ফেলল। কিন্তু আমি অনুভব করলাম, সে বিরক্ত হয়েও যেন বিরক্ত নয়, অসন্তুষ্ট হয়েও অসন্তুষ্ট নয়। সে চাচ্ছিল আমি যেন তার সাথে কথা বলি। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। এ জন্য চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ ক্রুদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে বোরখা পরিধান করে চলে গেল।'

আমি শাহ সাহেবকে বললাম, 'তাহলে সরদার বেলোনাত সিং মজিঠিয়ার মন্ত্রে কাজ হলো ?'

শাহ সাহেব বললেন, 'জী, কাজ হয়েছিল। দিনরাত সে শুধু ফুল দেখতে পেতো। আমি নিজেও কয়েকবার ভেবেছিলাম যে এসব বাজে কথা, কি আর হবে, কিন্তু কোকোজানের কথা শুনে আমার বিশ্বাস হলো যে মন্ত্র ফলপ্রসূ হয়েছে। অথচ আপনাকে যে মন্ত্র শোনালাম, তাতে প্রতিক্রিয়া হবে বলে বিশ্বাস করার মত কোন বিশেষত্ব নেই। কিন্তু একদিন সে দোকানে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলো।

আমি কয়েকবার তাকে চুমু খেলাম। সে কোন প্রতিবাদ করলো না। কিছু-ক্ষণ পর আমার ফুলদানিতে রাখা ফুল তুলে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল এবং বোরখা পরে চলে গেল।

কাহিনী দীর্ঘায়িত হয়ে যাচ্ছিল দেখে আমি শাহ সাহেবকে বললাম, 'আপনি সংক্ষেপে বলুন, পরিণাম কি হয়েছে? মেয়েটিকে আপনি পেলেন?'

শাহ সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'জী না, তার বিয়ে হয়ে গিয়ে-ছিল। কিন্তু বাসর ঘরে প্রবেশ করতেই—তার কি হলো কে জানে—সে মাথা ঘুরে পড়ে গেল, আর উঠলো না। তার হাতে ছিল বিভিন্ন রঙের সাতটা ফুল।

আমি দেখলাম, শাহ সাহেবের টেবিলের এক কোণে একটা ফুলদানিতে বিভিন্ন রঙের সাতটা ফুল শুঁকিয়ে আছে।

●

সৌন্দর্যের সৃষ্টি

কলেজে শাহেদা ছিল সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ে। নিজের রূপ সম্পর্কে সে পুরোপুরি অবহিত ছিল। এজন্য কারো সাথে সোজা মুখে কথা বলত না। নিজেকে মনে করতো মোঘল বংশের শাহজাদী। তার চেহারার গঠন বিন্যাসও মোঘল বংশের মেয়েদের মতোই, দেখে মনে হয় শিল্পীর অংকিত নূরজাহানের ছবিতে যেন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে।

কলেজের মেয়েরা অগোচরে তাকে শাহজাদী বলতো। শাহেদা শুনেছিল যে, তাকে এ উপাধি দেয়া হয়েছে। এজন্য তার অহংকার আরো বেড়ে গেল।

কলেজে সহশিক্ষা প্রচলিত ছিল। ছেলেদের সংখ্যা বেশী, মেয়েদের সংখ্যা সে তুলনায় কম। ছেলেরা মেয়েদের সাথে এবং মেয়েরা ছেলেদের সাথে মেলামেশা করতো তবে খুবই সংকোচের সাথে। কিন্তু শাহেদা তাও করতো না। সে নিজের রূপ-সৌন্দর্যের গর্বে মেতে থাকতো। সহপাঠিনী মেয়েদের সাথেও খুব কম কথা বলতো। ক্লাশে এসে এক কোণে প্রতিমার মতো বসে থাকতো, বড় চমৎকার প্রতিমা। তার ঘন কালো ভ্রূর নীচে ডাগর কালো নিটোল চোখ থাকতো ভাষাহীন। ছেলেরা ভাবতো এ সৌন্দর্য এতো নীরব কেন, পাথরের মতো নির্জীব কেন, তার তো স্পন্দিত হওয়া উচিত!

উজ্জ্বল ফর্সা গায়ের রং, চেহারায় মিষ্টতার ছাপ। অথচ সে নিজেকে রুক্ষ মেজাজ রূঢ় ভাষিণী বোঝাতে চাইতো। কলেজে প্রায় সব সময় সে নিজের গাম্ভীর্য বজায় রাখতো। একদিন তার সহপাঠি একটি ছেলে সাহসিকতার পরিচয় দিল। বলল, ভদ্রে, চরণে কাউকে জায়গা দিয়ে ধন্য তো করুন।

শাহেদা কোন জবাব দিল না। পরদিন ছেলেটিকে প্রিন্সিপাল ডেকে পাঠালেন এবং কলেজ থেকে বের করে দিলেন।

এ ঘটনার পর থেকে ছেলেরা দমে গেল। তারা শাহেদার প্রতি চোখ

তুলে চাওয়াও ছেড়ে দিল। সবার আশংকা, তাদের পরিণাম ঐ ছেলেটির মতো না হয়।

শাহেদা বি. এ. ক্লাশে অধ্যয়ন করতো। শুধু সুন্দরীই নয়, বেশ মেধাবীও, প্রফেসররা তার প্রশংসা করতেন। সে ছিল প্রিন্সিপাল সাহেবের বড় বোনের বড় ছেলের মেয়ে।

কলেজে কানাঘুষা চলতো। শাহেদার সম্পর্কে প্রায় সব ছেলেরাই উৎসাহী ছিল এজন্য তাকে নিয়ে আলোচনা করতো। কিন্তু তার সম্পর্কে খারাপ কিছু কেউ বলতে পারত না। কারণ সে ছিল দৃঢ় চরিত্রের অধিকারিণী। অবসর সময়ে ছেলেরা শাহেদার সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করতো আর ভাবতো, এ দুর্গ না জানি কে অধিকার করবে।

সবাই জানে, শাহেদা শুধু সুন্দর জিনিসই পছন্দ করে, অসুন্দর কোন কিছু সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

একদিন ক্লাশে একটি ছেলের নাক দিয়ে সর্দি ঝরছিল। শাহেদা সেদিকে চোখ পড়তেই ক্লাশ থেকে উঠে চলে গেল।

অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় হওয়ায় কুৎসিত, অপ্রিয় দর্শন, অসুন্দর কোন কিছু সে সহ্য করতে পারত না।

কলেজে জমিলা নামে একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি সুন্দরী নয়, কিন্তু শাহেদার চেয়েও অধিক মেধাবী। শাহেদা সে মেয়েটির মেধার কথা স্বীকার করলেও তাকে রীতিমত ঘৃণা করতো।

কলেজের ছেলেরা ভাবতো, শাহেদা যদি সুন্দরী না হতো তা হলেই ভালো ছিল, তারা অন্তত ওর সাথে একটু কথাবার্তা বলতে পারতো। কিন্তু শাহেদা সব সময় রূপের গর্বে এমন আত্মমগ্ন থাকে যে, পারত পক্ষে কারো প্রতি চোখ তুলে তাকায় না।

একদিন কলেজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। একটা ছেলে—তার পিতা চাকুরীতে বদলির কারণে এখানে এসেছেন—কলেজে ভর্তি হতে এলো। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সবাই তাকে দেখে নির্বাক হয়ে গেল। নবাগত ছেলেটি শাহেদার চেয়েও সুদর্শন।

ছেলেটির নাম শাহেদ। সে কলেজে ভর্তি হলো।

যে ক্লাশে শাহেদা পড়তো ঘটনাক্রমে শাহেদও সে ক্লাশেরই ছাত্র হলো। শাহেদের ভর্তির সময়ে শাহেদা কলেজে ছিল না, সর্দির কারণে সে দু'দিন ছুটি নিয়েছিল।

দু'দিন পর সকালের দিকে শাহেদ কলেজের বাগানে পায়চারি করছিল। এমন সময় দেখল একটা অত্যন্ত নিষ্প্রাণ সুন্দর প্রতিমা এগিয়ে আসছে। হাতের বই বাগানের বেঞ্চে রেখে শাহেদ এগিয়ে গেল।

শাহেদকে দেখে শাহেদা তার সৌন্দর্যে প্রভাবিত হলো এবং থমকে দাঁড়ালো। তারপর সে আস্তে আস্তে হাঁটছিল। এমন সময় শাহেদ তার দিকে এগিয়ে আসায় আতংকিত হয়ে শাহেদা পিচ্ছিল মাটিতে পা ফসকে পড়ে গেল।

শাহেদ সঙ্গে সঙ্গে তাকে উঠিয়ে দিল। শাহেদা হাঁটুতে আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু হেসে বলল, ধন্যবাদ! কিন্তু আপনি কে?

—একজন সেবক।

—সেবকের মতো মনে হচ্ছে না।

—তবে কি মনে হচ্ছে? অনেক সময় আসল জিনিসও নকল মনে হয়।

কথাটা শাহেদার খুবই পছন্দ হলো। হাঁটুতে ব্যথা করছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য সে ব্যথাও অনুভব করল না। বলল, আপনার নাম?

—শাহেদ।

শাহেদা ভাবলো সম্ভবত সে তার নাম শুনে দুষ্টুমী করছে। বলল, আপনি ভুল বলছেন।

—কলেজ রেজিস্ট্রার দেখে সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন।

—আপনি এ কলেজে পড়েন?

—জী হাঁ। আপনি এলেন কি জন্য?

—হায়, আমিও তো এ কলেজের ছাত্রী।

—কোন ক্লাশের?

—বি. এ. ক্লাশ।

—আমিও তো বি. এ. পড়ছি।

—মিথ্যে কথা, আপনাকে দেখে তো মালি মনে হয়।

—এ ধরনের চেহারার লোকেরা মালি হয় এটা ঠিক, কিন্তু দুঃখ হলো, আমি এখনো কোন ফুল ছিঁড়িনি।

—ফুল কি ছিঁড়তে আছে? ফুলের তো শুধু ঘ্রাণ নেয়া উচিত।

শাহেদ খানিক চুপ করে থেকে বলল, আমি আপনার ঘ্রাণ নিচ্ছি।

শাহেদা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, আপনি বড় বেতমিজ।

শাহেদ বেঞ্চের ওপর রাখা বই হাতে তুলে হেসে বলল, আমি তো আপনাকে ছিঁড়িনি, শুধু শুঁকেছি। আর আমার মনে হয় আপনার আচরণে অহংকারের গন্ধ রয়েছে। মাফ করবেন, অহংকার আমিও দেখাতে পারি। কিন্তু সে দেখাব পুরুষদের সাথে। আমি একটি ফুল, আপনি একটি কলি। আপনার সাথে আমার মোকাবিলা চলে না।

শাহেদা হাঁটু চেপে বসেছিল, হঠাৎ কাঁতরাতে লাগল, হায়, হায়! বড় ব্যথা করছে।

শাহেদ তার অনুমতি চেয়ে বলল, আমি কি একটু মালিশ করে দেব?

শাহেদা বলল, দিন।

শাহেদ শাহেদার হাঁটু এমন নিপুণভাবে মালিশ করল যে, পনের মিনিটের মধ্যে শাহেদার হাঁটুর সব ব্যথা সেরে গেল।

এ ঘটনার পর থেকে যখন কোন ক্লাশ থাকে না তখন তারা একত্রে বাইরে যায়, বাগানে বসে কি সব কথা বলে। সম্ভবত তারা পিচ্ছিল মাটিতে পা পিছলে পড়ে যেতে চাচ্ছিল যাতে তাদের হৃদয়ের হাঁটুতে চোট লাগে এবং তারা সারা জীবন সেখানে মলম লাগাতে পারে।

উভয়ে বেশ ভাল নম্বর পেয়ে বি. এ. পাশ করলো। শাহেদা শাহেদের চেয়ে পাঁচ নম্বর বেশী পেল। এ জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বলল, শাহেদা, আমি এ পাঁচ নম্বর এখনই আদায় করতে পারি।

—কিভাবে?

শাহেদ প্রথমবার শাহেদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে পাঁচবার চুমু খেল।

শাহেদা কোন প্রতিবাদ করল না, বরং খুশী হলো। কিছুক্ষণ পর বলল, আমাদের নম্বর পুরো হয়ে গেছে। এ ঘটনার পর আমি সিদ্ধান্ত

নিয়েছি, যথা শীঘ্র সম্ভব আমাদের বিয়ে হওয়া উচিত। আমি আর এ ঠোঁট অন্য কারো ঠোঁটে ছোঁওয়াতে চাই না।

শাহেদা ভাবতেই পারেনি যে, তার মনের ইচ্ছা এভাবে পূরণ হবে। এ খুশীতে সে আরও পাঁচ নম্বর উশুল করলো এবং শাহেদাকে বলল, প্রিয়তমা, আমি এ আশাতেই বেঁচে আছি।

শাহেদার পিতা-মাতা অন্যত্র তার বিয়ের আলাপ করছিলেন কিন্তু শাহেদা সেখানে বিয়ে করতে অস্বীকার করলো। সে স্পষ্ট জানিয়ে ছিল, অপ্রিয়দর্শন কোন যুবকের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলা তার দ্বারা সম্ভব নয়।

অনেক কথা কাটাকাটি হলো। অবশেষে শাহেদা জানিয়ে দিল যে সে নিজের সহপাঠি সুদর্শন শাহেদকে পছন্দ করে, ওকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করতে পারবে না।

শাহেদার পিতা-মাতা শাহেদের পিতা-মাতার সাথে দেখা করলেন। শাহেদকে দেখে শাহেদার পিতা-মাতা খুশী হলেন এবং শাহেদের পিতা-মাতাও তেমন আপত্তি করলেন না। তাছাড়া শাহেদ বিলেত যেতে চাচ্ছে, তবে বিলেত যাওয়ার আগে বিয়ে করে বউ নিয়ে যাবে এটা তার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

উভয় পক্ষের সম্মতির পর বিয়ে হয়ে গেল। তারা উভয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরস্পরকে পেয়ে খুব খুশী হলো। বাসর রাতে শাহেদ তার স্ত্রীকে বলল, আমাদের প্রথম সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, লোকজন তাকে দেখতে আসবে।

শাহেদা বলল, কেন?

শাহেদ হেসে বলল, প্রিয়তমা, তুমি দেখতে এত সুন্দরী, আমিও তেমন খারাপ নই। আমাদের সন্তান নিশ্চয়ই আমাদের দুজনের চেয়ে অধিক প্রিয়দর্শন হবে।

মধুচন্দ্রিমা পালনের জন্য তারা সুইজারল্যাণ্ড চলে গেল। সেখানে চার মাস কাটাল। তারপর লণ্ডন গেল। শাহেদ সেখানে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর

জন্য পড়াশোনা করবে।

লণ্ডনে শাহেদের পিতা মিয়া হেদায়েত উল্লাহর একটা বাসা ছিল। শাহেদ এবং শাহেদার লণ্ডন পৌঁছার আগেই সে বাসা খালি করা হলো। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই খুশী, কারণ তারা একটা সন্তানের প্রতীক্ষা করছিল।

শাহেদ বলতো, আমাদের সন্তানের সৌন্দর্যের কোন তুলনা হবে না।

শাহেদা বলতো, খোদা অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই ফুলের মতো সুন্দর হবে।

সময় ঘনিয়ে এলে শাহেদ স্ত্রীকে মেটারনিটি হোমে ভর্তি করে দিল।

লেবার ওয়ার্ডের বাইরে শাহেদ অস্থির ভাবে পায়চারি করছিল। তার চোখের সামনে উভয়ের সৌন্দর্যের ছাপ থেকে সৃষ্ট একটি শিশুর মুখচ্ছবি ফুটে উঠছিল।

লেবার ওয়ার্ডের নার্স বাইরে এলে শাহেদ তাকে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, শুভ সংবাদ?

—জী হাঁ।

—ছেলে নাকি মেয়ে?

নার্সকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। শুধু বলল, জানি না ছেলে নাকি মেয়ে। আমরা অমন শিশু আর দেখিনি।

শাহেদ তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, খুবই সুদর্শন তাই না?

নার্স বিকৃত সুরে বলল, বড় অদ্ভুত শিশু। দেখে মনে হয় তার মাথায় শিং, দাঁতও রয়েছে। নাক বড় বাঁকা ধরনের। চোখ দুটো রয়েছে, কিন্তু দেখে মনে হয় একটা চোখ যেন কপালে। তোমরা এত সুন্দর দুয়ে কেমন সন্তান জন্ম দিয়েছ?

শাহেদ নিজের সন্তানকে দেখতে গেল না, কিন্তু পরদিন সেই অদ্ভুত দর্শন শিশুকে পরিদর্শনের জন্য মেটারনিটি হোমে টিকিটের ব্যবস্থা করা হলো।

চোখ

সারা দেহের মধ্যে তার চোখ দুটোই আমার ভালো লেগেছিল।

চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছিল অন্ধকার রাতে সর্বাগ্রে চোখে পড়া মোটর গাড়ীর হেড লাইট। আপনারা ভাববেন না যে চোখ দুটো খুবই সুন্দর, তা কিছুতেই নয়। সুন্দর এবং অসুন্দরের মধ্যে পার্থক্য করার মতো বোধশক্তি আমার রয়েছে। কিন্তু মাফ করবেন, ওই দুটো চোখ সম্পর্কে শুধু এটুকু বলতে পারি যে, ওগুলো সুন্দর ছিলো না বটে তবে তাতে অস্বাভাবিক রকমের আকর্ষণ ছিল।

এ দুটো চোখের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল এক হাসপাতালে। আমি আপনাদের সে হাসপাতালের নাম বলতে চাই না, কারণ এ গল্পের সাথে তার উল্লেখে কোন লাভ নেই।

ব্যস, আপনারা বুঝে নিন যে কোন একটা হাসপাতাল হবে। সে হাসপাতালে আমার এক আত্মীয় অপারেশনের পর জীবনের শেষ দিনগুলো গুণছিল।

এমনিতে আমি রোগীদের কাছে গিয়ে ভরসা দেয়া, সান্ত্বনার কথা শোনানোর পক্ষপাতী নই। ওসব আমাকে দিয়ে হয়ে ওঠে না, কিন্তু স্ত্রীর ঐকান্তিক অনুনয়ে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রমাণ দেয়ার জন্য আমাকে হাসপাতালে যেতে হলো।

বিশ্বাস করুন আমি খুবই কুপিত বোধ করছিলাম। হাসপাতালের নার্সের প্রতিই আমার ঘৃণা রয়েছে কেন, তা জানি না। সম্ভবত এ কারণে যে, একবার আমার এক বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীর অবস্থা দেখতে আমাকে বোম্বের জে. জে. হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। বৃদ্ধার পায়ের গোড়ালীতে আঘাত লেগেছিল। হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে আমাকে কম পক্ষে আড়াই ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ওখানে যার সাথেই আলাপ করেছি তাকেই মনে হয়েছিল লোহার মত ঠাণ্ডা এবং অনুভূতিহীন।

আমার ভাল লাগা চোখ দুটোর কথা বলছিলাম।

পছন্দ অপছন্দ একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। খুব সম্ভব এ দুটো চোখ দেখে আপনাদের মন মানসে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। আপনাদের কাছে মন্তব্য চাওয়া হলে আপনারা বলবেন—খুব বাজে চোখ—এও বিচিত্র নয়। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে সর্বপ্রথম তার চোখ দুটোই আমার ভাল লেগেছিল।

মেয়েটি বোরখা পরিহিতাবস্থায় ছিল, তবে মুখে নেকাব ছিল না। হাতে একটা ওষুধের বোতল নিয়ে সে জেনারেল ওয়ার্ডের বারান্দায় একটি ছোট ছেলের হাত ধরে হাঁটছিল।

আমি তার দিকে তাকাতেই তার চোখ দুটোতে এক অদ্ভুত চমক সৃষ্টি হলো। চোখ দুটো বড়ও নয় ছোটও নয়, নীলাভও নয় সবুজও নয়, কালোও নয় বাদামীও নয়। তার প্রতি তাকাতেই কেন যেন আমার পা দুটো থেমে গেল। সেও দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গের ছেলেটির হাত জোরে আঁকড়ে ধরে বলল, হাঁটছিস না কেন?

ছেলেটি রুগ্ন স্বরে বলল, আমি তো হাঁটছি, তুই তো অন্ধ।

এ কথা শুনে আমি পুনরায় তার চোখের প্রতি তাকালাম। তার চোখের প্রতি তাকালাম। তার সকল অঙ্গের মধ্যে চোখ দুটোই আমাকে আকর্ষণ করলো।

আমি তার কাছাকাছি যেতেই সে অপলক চোখে আমার প্রতি তাকিয়ে বলল, এক্সরে কোথায় নেয়া হয়?

ঘটনাক্রমে সে সময়ে এক্সরে বিভাগে আমার এক বন্ধু কাজ করছিল। আমি তার সাথেও সাক্ষাৎ করব ভেবেছিলাম। মেয়েটির জিজ্ঞাসার জবাবে বললাম, এসো, আমি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি, আমিও ওদিকেই যাচ্ছি।

মেয়েটি সঙ্গী ছেলেটির হাত ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। ডাক্তার সাদেকের কথা জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম সে এক্সরে নেয়ার কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

দরজা বন্ধ। বাইরে রোগীদের ভিড়। আমি দরজার কড়া নাড়লাম। ভেতর থেকে তীব্র স্বর ভেসে এলো, কে? দরজার কড়া নেড়ো না।

কিন্তু আমি পুনরায় দরজার কড়া নাড়লাম। দরজা খুলে গেল। ডাক্তার সাদেক আমাকে গালি দিতে দিতে থেমে গিয়ে বলল, আরে, তুমি!

—হাঁ, ভাই, তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি। অফিসে গিয়ে শুনতে পেলাম তুমি এখানে।

—ভেতরে এসো।

আমি মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে বললাম, এসো। ছেলেটিকে বাইরে থাকতে দাও।

ডাক্তার সাদেক আমাকে জিজ্ঞেস করল, কে?

আমি বললাম, জানি না। এক্সরে বিভাগ খুঁজছিল। আমি বললাম, চল, নিয়ে যাই।

ডাক্তার সাদেক দরজার পাল্লা পুরো খুলে দিলে আমি মেয়েটিকে নিয়ে প্রবেশ করলাম।

চার-পাঁচজন রোগী ভেতরেও রয়েছে। ডাক্তার সাদেক তাড়াতাড়ি তাদের স্ক্রিনিং করে বিদায় করলো। তারপর কামরায় আমি এবং মেয়েটি বসে রইলাম।

ডাক্তার সাদেক আমাকে জিজ্ঞেস করল, ওর কি অসুখ?

আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, কি অসুখ তোমার? এক্সরে করার জন্য তোমাকে কোন্ ডাক্তার বলেছিল?

অন্ধকার কামরায় মেয়েটি আমার প্রতি তাকিয়ে জবাব দিল, আমি জানি না কি অসুখ। আমাদের পাড়ার এক ডাক্তার এক্সরে করাতে বলেছেন।

ডাক্তার সাদেক মেয়েটিকে মেশিনের কাছে আসতে বলল। মেয়েটি সামনে অগ্রসর হলে ডাক্তারের সাথে ধাক্কা খেল। ডাক্তার রুক্ষ স্বরে বলল, তুমি দেখতে পাও না?

মেয়েটি চুপ করে ছিল। ডাক্তার বোরখা খুলে তাকে স্ক্রিনের পেছনে দাঁড় করিয়ে সুইচ অন করল। আমি গ্লাসের প্রতি তাকিয়ে তার অভ্যন্তরের সব কিছু দেখতে পেলাম। তার হৃদপিণ্ড কালো চাকার

মত এক কোণে কাঁপছিল।

ডাক্তার সাদেক পাঁচ-ছ' মিনিট পর্যন্ত তাকে পরীক্ষা করল। তারপর সুইচ অফ করে দিল এবং আলো জ্বালিয়ে বলল, বুক অত্যন্ত পরিষ্কার।

মেয়েটি কি বুঝল কে জানে, পুরুষ্ট বুকে ওড়না পরিপাটি করে জড়িয়ে বোরখা খুঁজতে লাগলো।

বোরখা বেঞ্চির এক কোণে পড়েছিল। আমি তার হাতে তুলে দিলাম। ডাক্তার সাদেক রিপোর্ট লিখে তাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি?

মেয়েটি বোরখা পরিধান করতে করতে জবাব দিল, জী, আমার নাম—আমার নাম হানিফা।

—হানিফা! বলে ডাক্তার একটি কাগজে এক্সরে রিপোর্ট লিখে মেয়েটির হাতে দিয়ে বলল, যাও তোমার সেই ডাক্তারকে দেখাবে।

মেয়েটি হাতে দেয়া কাগজখানা বাহুর কাছে কামিজের ভেতর রেখে দিল।

বাইরে বেরিয়ে আমি অনিচ্ছা সত্বেও মেয়েটিকে অনুসরণ করলাম। কিন্তু আমি ভালভাবেই অনুভব করছিলাম যে, ডাক্তার সাদেক আমাকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। তাকে যতোটুকু জানি, সে ধরে নিয়েছিল যে মেয়েটির সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে। অথচ আপনারা জানেন এ ধরনের কোন ব্যাপার নয়, শুধু ওর চোখ দুটো আমার ভাল লেগেছিল!

আমি মেয়েটির পেছনে হেঁটে চললাম। সে সঙ্গের ছেলেটির একটি আঙ্গুল ধরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। টাঙ্গা স্টেণনে গিয়ে আমি হানিফাকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমরা কোথায় যাবে?

মেয়েটি একটি গলির নাম বলল। আমি মিছেমিছি বললাম, আমিও ওদিকেই যাব। চল তোমাদের বাসায় পেঁৗছে দেব।

আমি মেয়েটির হাত ধরে যখন টাঙ্গায় উঠিয়ে বসালাম তখন মনে হলো আমার চোখ যেন এক্সরের গ্লাসে পরিণত হয়েছে। তার হাড় মাংস কিছু নয় শুধু যেন দেহ কাঠামোই দেখতে পাচ্ছিলাম। তবে তার চোখ দুটো সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

ইচ্ছে হচ্ছে ওর পাশে গিয়ে বসি, কিন্তু ভাবলাম কেউ দেখে ফেলবে, এজন্য ছেলেটিকে তার পাশে বসিয়ে আমি মুখোমুখি আসনে বসলাম।

টাঙ্গা চলতে শুরু করলে হানিফা আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে ?

—আমি সাদত হাসান মাণ্টো।

—মাণ্টো—এই মাণ্টো-টা কি ?

—কাশ্মিরীদের একটা জাত।

—আমরাও কাশ্মিরী।

—তাই নাকি ?

—আমরা কুঙ্ ভাইস।

—ও-তো খুব উঁচু জাত !

মেয়েটি হাসলো। এতে তার চোখ দুটো আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো।

আমি জীবনে অনেক সুন্দর আকর্ষণীয় চোখ দেখেছি। কিন্তু হানিফার চোখ দুটি ছিল অস্বাভাবিক আকর্ষণীয়। আমি জানি না এই আকর্ষণের কি কারণ। আগেই বলেছি খুব সুন্দর চোখ বলা যায় না, তবু আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করছিল।

আমি সাহসিকতার পরিচয় দিলাম। এক গোছা চুল তার একটা চোখ ঢেকে দিয়েছিল। আমি সে চুলের গোছা সরিয়ে তার মাথায় গুঁজে দিলাম। সে কিছু মনে করল না।

আমি আরো সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তার একটা হাত হাতে তুলে নিলাম। মেয়েটি এতেও কোন আপত্তি করল না, তবে সঙ্গের ছেলেটিকে বলল, তুমি আমার হাত টিপছ কেন ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির হাত ছেড়ে দিয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের বাসা কোনখানে ?

ছেলেটি হাতের ইশারায় বলল, ঐ বাজারে।

টাঙ্গা সেদিকে অগ্রসর হলো। বাজারে খুব ভীড়। ট্রাফিকও খুব জ্যাম। টাঙ্গা খুব ধীরে ধীরে চলছিল। রাস্তায় ছোট-বড় গর্ত থাকায় টাঙ্গা জোরে জোরে ধাক্কা খাচ্ছিল। বার বার তার মাথা আমার

কাঁধের কাছে এসে পড়ছিল। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তার মাথা কোলে টেনে চোখ দুটো দেখতে থাকি।

কিছুক্ষণ পর তাদের বাসা এসে পড়ল। ছেলেটি টাঙ্গা থামাতে বলল। টাঙ্গা থামলে সে নীচে নেমে গেল। হানিফা বসে রইল। আমি তাকে বললাম, তোমাদের বাসা এসে গেছে।

হানিফা আমার প্রতি বিস্ময়কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বদরু কোথায়?

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন বদরু?

সে বলল, যে ছেলেটি আমার সঙ্গে ছিল।

আমি টাঙ্গার পাশে দাঁড়ানো ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললাম, এই যে দাঁড়িয়ে আছে।

—আচ্ছা। বলে মেয়েটি বলল, বদরু আমাকে নামিয়ে দাও।

বদরু তার হাত ধরে অনেক কষ্ট করে নীচে নামালো। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। পেছনের আসনে গিয়ে বসতে বসতে আমি ছেলেটিকে বললাম, কি ব্যাপার বদরু, ও নিজে নামতে পারে না?

বদরু জবাব দিল, জী, না,—ওর চোখ খারাপ, দেখতে পায় না।

যাও হানিফ, যাও

চৌধুরী গোলাম আব্বাসের একটি নতুন বক্তৃতার ওপর মতামত বিনিময় হচ্ছিল। 'টি হাউজের' পরিবেশ ছিল সেখানের চায়ের মতই গরম। সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, কাশ্মীর অধিকার করব, আর এই ডোগরা রাজকে অচিরেই উৎখাত করব।

সবাই মর্দে মুজাহিদ। যুদ্ধ বিদ্যায় কেউ পারদর্শী নয়। কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব। তাদের বিশ্বাস, ঐক্যবদ্ধ ভাবে একবার যদি ধ্বনি তোলা যায় তাহলে কাশ্মীর জয় করা যাবে, তখন আর ডক্টর গ্রাহামের প্রয়োজন থাকবে না। ইউ. এন. ও. তে ছ'মাস ধরে অনুনয় বিনয় করতে হবে না।

এসব মুজাহিদদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। কিন্তু মুশকিল হলো, পণ্ডিত জওহের লাল নেহেরুর মত আমিও কাশ্মিরী। এ কারণে কাশ্মিরীদের ব্যাপারে আমার দুর্বলতা অসামান্য। আমিও সব মুজাহিদদের সাথে একমত হলাম এবং সিদ্ধান্ত হলো যে যুদ্ধ শুরু হলে আমরা সবাই শামিল হবো এবং আমাদেরকে প্রথম কাতারে দেখা যাবে।

হানিফ এমনিতে উৎসাহ প্রকাশ করলো, কিন্তু আমি অনুভব করলাম যে, সে উদাসীন। অনেক ভেবেও আমি এর কোন কারণ খুঁজে পেলাম না।

চা খেয়ে বাকি সবাই চলে গেল। কিন্তু আমি এবং হানিফ বসে রইলাম। ক্রমে 'টি হাউজ' বলতে গেলে লোকশূন্য হয়ে পড়ল। আমাদের কাছ থেকে বেশ দূরে এক কোণে দু'টো ছেলে নাশতা খাচ্ছিল।

হানিফকে আমি অনেক বছর থেকে জানি। বয়সে আমার চেয়ে প্রায় দশ বছরের ছোট। বি. এ. পাশ করার পর ভেবেছিল উর্দুতে এম এ. দেবে নাকি ইংরেজীতে দেবে। আবার কখনো ভাবছিল, যাক চুলোয়—দেশ-ভ্রমণ করবে।

আমি হানিফের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকালাম। এসট্রেতে দিয়াশলাইর

যেসব পোড়া কাঠি পড়েছিল হানিফ সেগুলো তুলে টুকরো টুকরো করছিল। আগেই বলেছি, সে ছিল খুবই উদাসীন। আমি ভাবলাম, চমৎকার সুযোগ। ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কি কারণ। সে অনুযায়ী জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার হানিফ, তুমি নীরব কেন?

হানিফ ঝুঁকে থাকা মাথা উঁচু করে দিয়াশলাই-এর পোড়া কাঠি এক পাশে সরিয়ে রেখে বলল, এমনিতেই।

আমি সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করে বললাম, এটাতো ঠিক কথা নয়। এমনিতে হতে পারে না। সব কিছুরই কোন না কোন কারণ থাকে। সম্ভবত তুমি অতীত দিনের কোন ঘটনা সম্পর্কে ভাবছো।

হানিফ মাথা নেড়ে বলল, হুঁ।

আর সে ঘটনা কাশ্মীরের সাথে সম্পৃক্ত।

হানিফ চমকে উঠে বলল, আপনি জানলেন কি করে?

হেসে বললাম, শার্লক হোমস্ আমিও। আরে ভাই, কাশ্মীর নিয়ে কথা হচ্ছিল। তখনই আমি লক্ষ্য করেছি যে, তুমি গম্ভীর হয়ে পড়েছ। নিশ্চয়ই অতীতের কোন ঘটনা মনে পড়েছে। আমি ভেবে নিলাম, সে কাশ্মীর ছাড়া অন্য কোন স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না। আড্ডা, ওখানে কি কারো তোমার সাথে রোমান্স ঘটেছিল?

রোমান্স? তা জানি না। জানি না কি হয়েছিল, তবে তার স্মৃতি এখনো বিদ্যমান।

হানিফের কাহিনী শোনার প্রবল ইচ্ছে জাগলো। বললাম, যদি বিশেষ বাধা না থাকে ব্যাপারটা কি ছিল আমাকে শোনাতে পারো।

হানিফ আমার নিকট থেকে সিগারেট নিয়ে আগুন ধরিয়ে বলল, মাণ্টো সাহেব, রোমাঞ্চকর কোন ঘটনা নয়, কিন্তু আপনি যদি নীরবে শোনেন এবং আমাকে ডিষ্টার্ব না করেন তাহলে আপনাকে সব খুলে বলতে পারি।...এ ঘটনা আজ থেকে তিন বছর আগে ঘটেছিল। আমি গল্প লেখক নই, তবু আপনাকে সবকিছু সাজিয়ে বলতে চেষ্টা করব।

আমি কথা দিলাম যে তার গল্প বলার মধ্যে কোন কথা বলব না। আসলে হানিফ নিজের মন-মগজের গভীরতায় প্রবেশ করে আমাকে নিজের কাহিনী

শোনাতে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর হানিফ বলল, মাস্টো সাহেব, এটা আজ থেকে তিন বছর আগের কথা। তখন ভারত বিভক্তির কথা কেউ চিন্তাও করেনি। গ্রীষ্মকাল। কেন জানি না, মন খুবই উদাস হয়ে পড়েছিল। ভাবলাম প্রত্যেক অবিবাহিত যুবকই এ সময়ে উদাসীনতা অনুভব করে। সে যাক্‌গে। আমি একদিন কাশ্মীর যাবার ইচ্ছে করলাম। সংক্ষিপ্ত কিছু জিনিষপত্র নিয়ে লরিতে তুললাম এবং লরীস্ট্যাণ্ডে গিয়ে টিকেট করে বসলাম। লরী কুদ নামক স্থানে পেঁছিলে আমার ইচ্ছে বদলে গেল। ভাবলাম, শ্রীনগরে কি আছে, অসংখ্যবার দেখেছি। এর চেয়ে পরবর্তী স্টেশন বাটুতে নেমে পড়ব। শুনেছি বাটুও খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। টি. বি. রোগীরা এখানে আসে এবং সুস্থ হয়ে চলে যায়।

আমি বাটুতে নেমে পড়লাম এবং একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হোটেল সাধারণ ধরনের। কিন্তু অসুবিধা নেই। বাটুও আমার পছন্দ হলো। সকালে একদিকে বেড়াতে যেতাম, ফিরে এসে খাঁটি মাখন এবং ডবল রুটি দিয়ে নাশতা খেয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়তাম।

সে চমৎকার স্বাস্থ্যকর স্থানে দশদিন বেশ ভালভাবে কাটালাম। আশেপাশের দোকানদাররা আমার বন্ধু হয়ে গেল। বিশেষত দরজী সর্দার লহনা সিং-এর দোকানে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম। প্রেম-ভালবাসার কাহিনী শোনানোর ব্যাপারে তার সখ ছিল বলা যায়। মেশিন চালানো অবস্থায় সে কোন প্রেম-কাহিনী হয়তো শুনতো অথবা শোনাতো। বাটু-এর সব জিনিস সম্পর্কে তার টনটনে জ্ঞান ছিল। কে কার সাথে প্রেম করছে, কাদের মধ্যে মনোমালিন্য চলছে, কে কার কাছে চিঠি লিখছে এ জাতীয় সব কথা যেন তার পকেটে ভরা থাকতো।

বিকেলে আমি এবং লহনা সিং উতরাই-এর দিকে বেড়াতে যেতাম, বানেহালের দররা পর্যন্ত পেঁছে আবার ফিরে আসতাম। হোটেল থেকে উৎরাই যাবার পথে প্রথম মোড়ে গেলে ডানদিকে একটা বেশ সুন্দর মাটির ঘর। একদিন সর্দারজীকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি বাস করার জন্য? ঘরটা এবং পরিবেশ বেশ ভালো লেগেছিল, এজন্যই জিজ্ঞেস

করেছিলাম। সর্দার বলল, হাঁ বসবাসের জন্যই বলা যায়। বর্তমানে এখানে সারগোদার একজন রেলওয়ে অফিসার অবস্থান করছেন। তার স্ত্রীর অসুখ। আমি বুঝে গেলাম যে, টি. বি. হয়েছে। আমি টি. বি.কে কেন এত ভয় পাই খোদাই জানেন। সেদিনের পর থেকে যখনই আমি সে পথ দিয়ে যেতাম নাকে-মুখে রুমাল গুঁজে যেতাম। আমি কাহিনী দীর্ঘায়িত করতে চাই না। সংক্ষিপ্ত কথা হলো, সেই রেলওয়ে অফিসার কুদন লালের সাথে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। আমি অনুভব করলাম, স্ত্রীর অসুখের প্রতি তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ওটাকে একটা দায়িত্ব মনে করে পালন করছে। সে অফিসার স্ত্রীর কাছে খুবই কম যেতো, ফিনাইল ছড়ানো অন্য একটা কামরায় সে থাকতো। রোগীর ছোট্ট বোন সামিত্রী তার দেখাশোনা করতো। মেয়েটির বয়স হবে বড় জোর চৌদ্দ, এই মেয়ে সব সময় নিজের বোনের দেখা-শোনা, সেবা-শুশ্রূষা করতো।

সামিত্রীর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল একটা নালার ধারে। পাশে অনেকগুলো ময়লা কাপড় রেখে সম্ভবত একটা সালোয়ার ধুচ্ছিল। আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। পদশব্দে চমকে ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখে করজোড়ে প্রণাম করল। আমি জবাবী প্রণাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমাকে চেন? সামিত্রী মিহিন কণ্ঠে বলল, জী হাঁ, চিনি। আপনি বাবুজীর বন্ধু। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, হালকা পাতলা গড়নের মেয়ে, তার রূপ লাবণ্যে আমি চমৎকৃত হলাম। ইচ্ছে হলো তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলি এবং দু'একটা কাপড় ধুয়ে দিই তাহলে তার কাজ কমবে, কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই এতোটা ঘনিষ্ঠতা সমীচীন মনে হচ্ছিল না।

সেই নালাতেই সামিত্রীর সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হলো। সে কাপড়ে সাবান মাখাচ্ছিল। আমি তাকে নমস্তে বলে পাশে ঘাসের উপর বসে পড়লাম। সে কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। কিন্তু উভয়ে কথা বলতে শুরু করলে এক সময়ে তার আতঙ্ক ভাব কেটে গেল। সে এতোটা স্বাভাবিক এবং সহজ হয়ে উঠেছিল যে, তাদের পরিবারের সব কথা

আমাকে বলে ফেলল।

প্রায় পাঁচ বছর আগে সামিত্রীর বাবুজী অর্থাৎ কুন্দন লালের বিয়ে হয়েছিল। প্রথম কয়েক বছর তাদের সম্পর্ক মোটামুটি ভালোই ছিল। কিন্তু ঘুষের অভিযোগে চাকুরী থেকে বরখাস্ত হবার পর স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রি করতে চাইল। অলঙ্কার বিক্রি করে দ্বিগুণ লাভের আশায় সে জুয়া খেলতে চাইলো। কিন্তু তার স্ত্রী কথা মানলো না। ফলে তাকে মারপিট শুরু করলো, একটা ছোট অন্ধকার কামরায় বন্দী করে সারাদিন অনাহারে রাখতো। অনেকদিন এ রকম নির্যাতন ভোগ করে করে অবশেষে তার স্ত্রী নিজের সব অলঙ্কার স্বামীর হাতে তুলে দিল। কিন্তু অলঙ্কার হাতে পাওয়ার পর ছ'মাস বাড়ীমুখে হলো না। এ সময়ে সামিত্রীর বোন অনাহারে অনাহারে দিন কাটালো। ইচ্ছে করলে সে বাপের বাড়ী চলে যেতে পারতো। তার বাবার অবস্থা খুব ভালো। তা ছাড়া বাবা মা তাকে খুব স্নেহ করতেন। কিন্তু সে বাপের বাড়ী যাওয়া সমীচীন মনে করলো না। ফলে টিবিতে আক্রান্ত হলো। ছ'মাস পর হঠাৎ করে কুন্দন লাল বাড়ী ফিরে এলো। এসে দেখে স্ত্রী শয্যাশায়ী। ইতিমধ্যে চেষ্টা তদবির করে কুন্দন লাল চাকরী ফিরে পেয়েছিল। এতদিন কোথায় ছিল জিজ্ঞেস করায়, সে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেল।

সামিত্রীর বোন স্বামীকে অলঙ্কারের কথা কিছুই জিজ্ঞেস করল না। স্বামী ফিরে এসেছে এতেই তার আনন্দ হচ্ছিল। ভগবান তার প্রার্থনা শুনেছেন তিনি তার স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এই ছিল যথেষ্ট। ক্রমে তার রোগ কিছুটা সেরে গেল। স্বাস্থ্য ভাল হলো। কিন্তু ক'দিন পর তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। ততদিনে সামিত্রীর বাপ-মা খবর পেয়েছেন। তারা মেয়েকে দেখতে এসে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুন্দন লালকে রাজী করালেন। সব খরচ তারাই বহন করলেন। কুন্দন লাল ভাবলো, ক্ষতি কি, নতুন জায়গায় ভ্রমণ করা যাবে। বাটুতে যাওয়ার সময় কুন্দন লাল সামিত্রীকেও সঙ্গে নিল।

বাটুতে এসে স্ত্রীর প্রতি সে মোটেই নজর দিত না। সারাদিন বাইরে তাস খেলত। সামিত্রী নাম মাত্র খাবার তৈরী করাতো, এজন্য কুন্দন লাল হোটেলে খেত। প্রতি মাসে শ্বশুরালয়ে লিখে পাঠাতো যে খরচ বেশী

হচ্ছে। টাকার পরিমাণ যেন বাড়িয়ে দেয়া হয়।

আমি কাহিনী দীর্ঘায়িত করতে চাই না। সামিত্রীর সাথে তখন দেখা হতো। যে নালায় সে কাপড় ধুতো সেখানে ছিল খুবই ঠাণ্ডা, সেব গাছের ছায়ায় বসে ঘাস ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মন চাইতো দিনভর নালার স্বচ্ছ পানিতে ছুঁড়তে থাকি। এ সামান্য কাব্য এজন্যই করলাম, যেহেতু তখন সামিত্রীর সাথে আমার ভালবাসা গড়ে উঠেছে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম সে আমাকে মেনে নিয়েছে। একদিন উত্তেজনা বশে তাকে বুকে জড়িয়ে তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখলাম, সে আবেশে চোখ বুঁজলো। সেব-এর শাখায় ছোট পাখীরা কিচির মিচির করছিল, নালার স্বচ্ছ টলটলে পানি সঙ্গীতের মত সুর তুলে বয়ে যাচ্ছিল।

সামিত্রী ছিল খুবই সুন্দরী, তবে তার দেহের গরণ ছিল খুব হাল্কা পাতলা। ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে তার পাতলা হওয়াই যথার্থ হয়েছে। যদি সে আরো কিছুটা মোটা হতো তাহলে সৌন্দর্যের ফুল অমন প্রস্ফুটিত মনে হতো না। তার কালো হরিণ-চোখে প্রাকৃতিক সুরমা লাগানো ছিল, মাঝারী ধরনের লম্বাটে, ঘন কালো চুল কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত, ছোট দু'টি স্তন। মাণ্টো সাহেব, আমি তার ভালবাসায় নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।

একদিন সে আমার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসার কথা প্রকাশ করছিল। আমি তখন বেশ কিছুদিন থেকে মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিদ্ধ হওয়া একটা কথা তাকে জিজ্ঞেস করলাম। বললাম, দেখ সামিত্রী, আমি মুসলমান আর তুমি হিন্দু, বল পরিণাম কি হবে? আমি এমন লম্পট নই যে, তোমাকে নষ্ট করে পালিয়ে যাব। আমি তোমাকে আমার জীবন সাথী করতে চাই। সামিত্রী আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, হানিফ, আমি মুসলমান হয়ে যাব।

আমার বুকের বোঝা দূর হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত হলো যে তার বোন ভাল হয়ে গেলে সে আমার সাথে চলে যাবে। তার বোন ভালো কি হবে, কুন্দন লাল বলছিল, সে ওর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। কথাটা একদিক থেকে সত্যি। অসুখটাই এমন যে, ভাল হওয়াই দুষ্কর।

সামিত্রীর বোনের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগলো। কুন্দনলালের তাতে কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। শ্বশুরালয় থেকে টাকা অধিক পরিমাণে আসছিল। খরচ কমে গিয়েছিল, এজন্য সে ডাক বাংলোতে গিয়ে মদ খেতে শুরু করলো। এ সময়ে বাড়ীতে সে সামিত্রীকে উত্যক্ত করতো।

মাণ্টো সাহেব, এটা শুনে আমার চোখে যেন রক্ত নেমে এলো। সাহস ছিল না, না হলে খোলা রাস্তায় তাকে জুতো পেটা করতাম। সামিত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার অশ্রু মুছে দিয়ে আমি ভালবাসার কথা শুনিয়ে এক সময় হোটেলে ফিরে আসতাম।

একদিন খুব ভোরে বেড়াতে বেরোলাম। সামিত্রীদের বাসার কাছে পেঁাছে অনুভব করলাম যে, সামিত্রীর বোন বেঁচে নেই। ভেতরে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কুন্দন লালকে আওয়াজ দিলাম। আমার ধারণাই ঠিক হলো। হতভাগিনী রাত এগারোটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

কুন্দন লাল আমাকে বলল, আমি যেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি, সে লাশ সৎকারের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে। একথা বলে সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সামিত্রীর কথা আমার মনে পড়ল। সে কোথায়? যে কামরায় সামিত্রীর বোনের লাশ সে কামরা ছিল নীরব, নিঃশব্দ। পরবর্তী কামরার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম সামিত্রী একটা পুটলির মত দলা পাকিয়ে শুয়ে আছে। আমি ভেতরে চলে গেলাম। তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, সামিত্রী, সামিত্রী! কিন্তু সে জবাব দিল না। লক্ষ্য করলাম তার সালোয়ারে কোঁটা কোঁটা দাগ। আমি আবার কাঁধ ঝাঁকালাম কিন্তু সে চুপ করে রইল। আমি প্রীতিভরা কণ্ঠে বললাম, আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কি ব্যাপার সামিত্রী? সামিত্রী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, যাও হানিফ, যাও। আমি বললাম, কেন যাব? আমি দুঃখিত, তোমার বোনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তুমি কেঁদে কেঁদে নিজেকে কষ্ট দিয়ো না। সামিত্রীর কণ্ঠে কথা আটকে যাচ্ছিল। সে তবু ধীরে ধীরে বলল, সে মরে গেছে, আমি তার জন্য দুঃখ করি না, কিন্তু আমি নিজেই মরে গেছি। আমি এ কথার অর্থ বুঝলাম না। বললাম, তুমি মরবে কেন, তোমাকে তো আমার জীবন সঙ্গী হতে হবে। একথা শুনে সামিত্রী হাউমাউ করে কেঁদে

উঠলো। বলল, যাও হানিফ, যাও। আমি আর এখন কোন কাজের নই—কাল রাতে···কাল রাতে বাবুজী আমাকে সর্বস্বান্ত করেছে। আমি যখন চীৎকার দিয়েছি, আমার বোন তা শুনতে পেয়ে সেও অন্য কামরায় চীৎকার দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছে। আমার বোন বুঝতে পেরেছিল। হায়, যদি আমি চীৎকার না করতাম, সে কি আমাকে রক্ষা করতে পারতো! যাও হানিফ, যাও। এই বলে সামিত্রী আমার বাহু ধরে আমাকে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ পর হারামজাদা কুন্দন লাল চার-পাঁচজন লোক সঙ্গে নিয়ে এলো। সত্যি বলছি, যদি সে একা হতো তবে মাথা ভেঙ্গে তাকে আমি জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতাম। ব্যস এই হলো, আমার কাহিনী। সামিত্রীর শেষ তিনটি শব্দ—যাও হানিফ, যাও—সব সময় আমার কানে গুঞ্জরিত হয়ে থাকে। কি অপরিসীম দুঃখ এ তিনটি শব্দে সঞ্চিত ছিল। হানিফের চোখে অশ্রু চিক চিক করছিল। আমি বললাম, যা হবার হয়ে গেছে, তুমি তাকে গ্রহণ করলে না কেন?

হানিফ মাথা নীচু করে নিজেকে একটা মোটা গালি দিয়ে বলল, দুর্বলতা—পুরুষরা সাধারণত এ ব্যাপারে খুবই দুর্বল হয়—এ দুর্বলতার প্রতি অভিশাপ দিচ্ছি।

বাচনি

ধাঙ্গড়দের সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। বিশেষত বিভাগ পূর্বকালে যেসব ধাঙ্গড় অমৃতসরে বাস করতো তারাই ছিল আলোচ্য বিষয়। মজিদের বিশ্বাস অমৃতসরের ধাঙ্গড়দের মত উদগ্র যৌবনা মেয়ে আর কোথাও পাওয়া যায় না। বিভাগ পরবর্তীকালে তারা কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে কে জানে!

রশীদ গুজরি ধাঙ্গড়দের প্রশংসা করছিল। মজিদকে সে বলল, অমৃতসরের ধাঙ্গড়রা যৌবনকালে অত্যন্ত আকর্ষণীয় থাকে এটা অস্বীকার করছি না, কিন্তু তাদের এ যৌবন বেশীদিন থাকে না। যুবতী হওয়ার পর দেখতে না দেখতেই তাদের যৌবন চলে যায়, তাদের যৌবন কোন চোর চুরি করে নেয় কি জানে! আমাদের ওখানে একটা ধাঙ্গড় কাজ করতো, তার যৌবনের চমক দেখে নিজের দুর্বল যৌবনকে তুচ্ছ মনে হতো, এ জন্যে তার সাথে কখনো কথাই বলতাম না! নাম ছিল ফাতেমা। খৃস্টান মিশনারীরা তাকে নিজেদের ধর্মে দীক্ষিত করে নেয়। ফাতেমা নাম হলেও বাড়ীতে তাকে ফাতু বলে ডাকা হতো। কিন্তু খৃস্টান হয়ে যাওয়ার পর খৃস্টান মিশনারীর লোকেরা তার নাম রাখলো মিস ফাতু। সকালে সে ব্রেকফাষ্ট করতো, দুপুরে লাঞ্চ এবং রাতে ডিনার।

কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা গেল তার উদগ্র যৌবন যেন বিগলিত হয়ে পড়েছে। তার উন্নত বুক করুণভাবে ঢলে পড়ল। অথচ তার তুলনায় আমাদের ঘরে উপল নিয়ে আসা মেয়েটির যৌবন অটুট ছিল। ধার্মন্তরিত ধাঙ্গড় আর উপল নিয়ে আসা ধাঙ্গড় উভয়ের বয়স ছিল একই রকম। তিন বছর সে আমাদের এখানে কাজ করেছে, অথচ এর মধ্যে তার যৌবনের যেন কোন পরিবর্তনই হয়নি। পরে তার বিয়ে হয়ে যায়। তার কোমরের, ঘাড়ের একটুখানি স্পন্দনও ছিল দেখার মতো। বিয়ের পর সে তিনটি সন্তানের মা হয়, অথচ সে যেন ঠিক আগের মতই রয়েছে। এজন্য বলছি গুজরি ধাঙ্গড়দের কোন তুলনা হয় না, আমাদের এ কথা তোমাকে মানতেই হবে।

মজিদ জ্বলে যাচ্ছিল। ডিব্বা থেকে সে পানের খিলি বের করে মুখে দিল। দিয়াশলাইর কাঠি দিয়ে একটি কৌটো থেকে খানিক কিমাম বের করে মুখে পুরে বলল, রশীদ ঠিকই বলেছ, কিন্তু আমার মাথায় যে ধাঙ্গড়ের স্মৃতি জাগরুক রয়েছে আর যার কথা আমি আসলেই বলতে চাই, তার কাছে কোন গুজরি পৌঁছুতে পারবে না। সে ছিল একটা প্রলয়, রীতিমত একটা চেতনা। তুমি আমার কাছ থেকে একটা কাহিনী শোন, তাহলে তার সম্পর্কে স্পষ্ট বুঝতে পারবে। যৌবন ঢলে পড়া সম্পর্কে তুমি যা বলছো সে আমি ভাল করেই জানি। গুজরিরা স্বভাবতই বেশ লম্বাটে, প্রাকৃতিক কারণেই তাদের তাড়াতাড়ি ঢলে পড়া উচিত, অথচ তা কিন্তু হয় না। কারণ তারা নগ্ন পায়ে থাকে এবং তোমার বর্ণনা অনুযায়ী পাহাড়ের মত উঁচু উপলের বোঝা মাথায় নিয়ে চলাফেরা করে। কিন্তু এখন গুজরিদের কথা রাখো, আমাকে বাচনির কথা বলতে হবে। বাচনি ছিল আমাদের পাড়ার এক উদগ্র যৌবনা ধাঙ্গড়। মাঝারী ধরনের দেহ, মুখ যেন খাপখাড়া তলোয়ার। বিবাহিত ছিল। প্রতিদিন স্বামীর সাথে ঝগড়া লড়াই করতো। আমাদের কম্পাউণ্ডে ওরা স্বামী-স্ত্রী প্রতিদিন ভোরে আসতো এবং একটি গাছের সাথে দোলনা ঝুলিয়ে শিশুকে শুইয়ে রাখতো। কিন্তু মুশকিল হলো দোলনা দোলানোর কেউ ছিল না। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ঝাড়ু দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে দোলনায় দোল দিত, বা কোলে নিয়ে পায়চারি করতো।

রশীদ মজিদকে বলল, এই দোলনার কথা এলো কোত্থেকে? তুমি তো একটা উদগ্র যৌবনা ধাঙ্গড়ের কথা বলছিলে, তোমার ভাষায় সে ছিল খুবই সুন্দরী।

মজিদ সঙ্গে সঙ্গে বলল, দোস্ত, তুমি দোলনার সাথে জড়িয়ে গেলে কেন? আমার কাহিনীটা তো পুরোপুরি শুনবে। এটাও আসলে বাচনিরই কাহিনী, যে বাচনিকে আমি সারাজীবন ভুলতে পারব না। সে ছিল একটা আপদ। সকালে লম্বা ঝাড়ু হাতে, মাথায় রকমারি জিনিসের বোঝা নিয়ে স্বামীর সাথে আমাদের পাড়ায় আসতো। দেখে মনে হত যে ঝাড়ু এক্ষুণি আপনার মাথায় মেরে বসবে। কিন্তু তা কখনো করেনি। তার স্বামী,

কি যেন তার নাম মনে নেই—লম্বায় ছিল তার স্ত্রীর চেয়ে ছোট। সে কাজের সময় স্ত্রীকে গালাগাল করতো, যারা শুনতো তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতো।

রশীদ কাহিনী দীর্ঘায়িত হতে দেখে বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি আসল কথায় আসো। এদিক ওদিকের কথা রাখো। বাচনি খুব ভাল নাম, না হলে তোমার এ বক বক শুনতাম না। এ তোমার সাজানো কাহিনী কি না কে জানে! যাক গে, তোমাকে কয়েক মিনিট সময় দিচ্ছি, শোনাও।

মজিদ রুষ্টস্বরে বলল, আরে উল্লুক, তুমি শুধু বাচনির নামটাই শুনেছ, ওকে যদি দেখতে, তবে হৃদয় খুলে তার আঁচলে দিয়ে দিতে। আমি এ কাহিনী শোনাচ্ছি, এতে কিছু লবণ মরিচ লাগানোর অনুমতি থাকা উচিত, তুমি যদি বিরক্ত হয়ে পড়ো তবে জাহান্নামে যাও।

রশীদের অন্য কোন কাজ ছিল না, অতো টাকাও ছিল না যে সিনেমায় যাবে। এজন্যে মজিদের কাহিনী শোনাই সমীচীন মনে করলো। বলল, জাহান্নামে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তুমি একটু সংক্ষিপ্ত করো। আসলে তোমার বাচনিকে আমার ভালো লাগছে।

মজিদ রেগে বলল, তোমার ভাল লাগার নিকুচি করি, তুমি কে এমন যে, ওকে তোমার ভালো লাগতে হবে! শুধু তুমি নও, তোমার মতো অনেকেরই তাকে ভালো লাগতো। কিন্তু সে কাউকে পাত্তা দিতো না। আমি তোমার চাইতে অনেক বেশী দুদর্শন, অথচ আমি সবসময় তার করুণার দৃষ্টি কামনা করেছি। বড় জাঁদরেল মেয়ে বাচনি। সত্যি বলছি রশীদ, অমন মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি, নাম বাচনি হলে কি হবে আসলে সে ছিল একটা ডাহা কুটনি। আমি ওকে নিজের অধিকারে আনার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হতে পারিনি। সে কিছুতেই ধরা দিতো না।

রশীদ বলল, তুমি দোস্ত, এসব ব্যাপারে বরাবরই আনাড়ি ছিলে।

মজিদের চোট লাগলো। বলল, বাজে বকো না, একদিন আমি তাকে জাপটে ধরেছি, আমার ঘরের বাইরে সে ঝাড়ু দিচ্ছিল, আমি তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম।

তারপর কি হলো? রশীদ কৌতুক করে সিগারেট ধরালো এবং দিয়াশলাইর কাঠি কয়েক টুকরো করে ভেঙ্গে এসট্রেতে রাখলো।

মজিদের মনে হলো রশীদ যেন তাকে ভেঙ্গে এসট্রেতে রাখছে। খুবই বিরক্ত হলো, কিন্তু লোক ভাল ছিল এজন্যে মিথ্যা বলতে পারল না। বলল, দোস্ত রশীদ, তুমি ঠাট্টা করছো, কিন্তু আসলে সেদিন যা হয়েছিল তা ঠাট্টা বিদ্রূপ করার মতোই। আমি যেই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম, হারামজাদী সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখে ঝাড়ু মেরে বসল। লজ্জায় আমি ঘরের ভেতরে ছুটে গেলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরোলাম, দেখি। সে একই ভাবে ঝাড়ু দিচ্ছে। আবার তাকে জাপটে ধরলাম। কিন্তু এবার সে কোন প্রতিবাদ করল না। আমি ভাবলাম……

রশীদ বলল সব ঠিক—।

মজিদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, ছাই ঠিক! সে আমার নিকট থেকে নিজেকে মুক্ত করে সোজা আমার স্ত্রীর কাছে চলে গেল। কিন্তু তার কাছে কোন অভিযোগ করল না। আমি ভয়ে চুপসে গিয়েছিলাম। শুনলাম সে বলছে, বিবিজী, আজও পানি এলো না। যারা আপনাদের কাছ থেকে মাসে দশ টাকা বিল নেয় তাদের কি হয়েছে বলুনতো! তারা কেন ভেবে দেখে না যে, মশকীকে প্রতিদিন দশ মশক পানির জন্যে চার আনা করে দিলে আড়াই টাকা লেগে যায়। আমার বুকের ভার হালকা হলো, খোদার শুকরিয়া আদায় করলাম। আবার ভাবলাম, বাচনিই আমার সম্মান রেখেছে, কিন্তু এরকম চিন্তা করা কুফুরী।

রশীদ প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বলল, আরে কাফেরের বেটা, আসলে কথা হলো, বাচনিকে তুমি কাবু করতে পেরেছ কিনা তাই এবার বলো।

মজিদ রশীদের ডিব্বা থেকে আরো একটি পান মুখে পুরে বলল, দেখ রশীদ, তুমি বাচনিকে জানো না। সত্যি বলছি, যদি আমি গল্পকার হতাম তবে বাচনিকে একটা জীবন্ত চরিত্র হিসেবে ফুটিয়ে তুলতে পারতাম। সে যে কি ছিল ভেবে পাই না। বয়স ছিল তার বড় জোর সতের-আঠারো, লম্বায় সাড়ে চার ফুট হবে, বুক এমন দৃঢ়—দেখে মনে হয় যেন লোহার

তৈরী, অথচ সে এক সন্তানের মা।

রশীদ বলল, রাখো তোমার এক সন্তানের মা—তুমি কাহিনী শেষ করো। আমাকে একটা জরুরী কাজে যেতে হবে। সাড়ে সাতটা বাজে, অথচ তোমার কাহিনী শেষই হচ্ছে না।

মজিদ গম্ভীর স্বরে বলল, রশীদ লালে, ব্যাপার বড় গুরুতর।

রশীদ বলল, কার, তোমার না আমার ?

মজিদ বলল, জানি না, কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি তখন আমার ব্যাপারই গুরুতর ছিল। বুঝতে পারছিলাম না যে কি করব, কি না করব। তুমি ভেবে দেখ আমি হাজার হাজার টাকার মালিক। তুমি তো জানোই বাবা-মা মারা যাওয়ার পর সব সম্পত্তি আমি পেয়েছি, যেখানে যতো টাকা ইচ্ছা খরচ করতে অসুবিধা ছিল না। বাচনিকে বুকে জড়িয়ে ধরার পর সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমার স্ত্রীর কাছে নালিশ না করায় ভাবলাম কয়েকবার এরকম করার পর আমি সফল হবো।

রশীদ জিজ্ঞেস করল, সফল হয়েছ ?

মজিদ বলল, ছাই হয়েছি! তুমি ওকে জানোই না। বড় জাঁদরেল মেয়ে। স্বামীকে পরোয়া করতো না। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার, আমি যা কিছু করেছি এ সম্পর্কে সে কারো কাছে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। অথচ সে ইচ্ছে করলে আমাকে আমার স্ত্রীর সামনে বেইজ্জত করে ঘরের বার করতে পারতো।

রশীদ হেসে বলল, তোমার বাচনিকে আমি জানি।

মজিদ বিস্ময়ভরে বলল, তুমি ওকে জানো কি ভাবে ?

রশীদ বলল, তুমি যেভাবে জানো, সেভাবেই জানি। তুমি কি ঠিকা নিয়েছ যে, তোমার এলাকাতেই সে কাজ করবে অন্য কোথাও করতে পারবে না ? আমি তাকে ভাল করেই জানি।

মজিদের বিশ্বাস হলো না। বলল, বাজে বকো না, তার বয়সই বা কতো যে তুমি তাকে জানবে। দু'বছরের কিছু বেশী সময় ধরে সে আমাদের পাড়ায় আসছিল। আমাদের এখানে আসবার পর তার কোন সন্তান ছিল না, দু'তিন মাস পর তার কোলে ছেলে এলো।

রশীদ হেসে বলল, তোমার ?

আমার ! মজিদ রসিকতার জবাব দিয়ে বলল, আমার হলে তো কোন কথাই ছিল না। কমপক্ষে এটা তো বলতে পারতাম যে নিজের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

রশীদ অদ্ভুত ভাবে হেসে বলল, তুমি কি তোমার বাচনির স্বামীর নাম জানো ?

—না।

—আমি বলছি তোমাকে—তার স্বামীর নাম রশীদ ?

মজিদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, তার নাম রশীদ।

রশীদ দৃঢ়তার সাথে বলল, হাঁ, তার স্বামীর নাম রশীদ। আসলে রশীদই তার প্রকৃত স্বামী।

মজীদ ধীরে ধীরে বলল, তাহলে আমার পাড়ায় যে ঝাড়ু দিত এবং শিশুকে দোলনায় দোলাতো, সে কে ?

রশীদ বলল, আড়ে উল্লুক, সে নিজের সন্তানকে দোলনায় দোলাত না।

—তবে কাকে দোলাতো ? সে কি তবে সেই রশীদের সন্তান নয় ?

—না।

—তবে কার সন্তান ?

—একজন দরিদ্র লোকের, যে কিনা সুদর্শন নয়, তোমার চেয়ে অনেক অপ্রিয়দর্শন।

—কে সে ?

—জিজ্ঞেস করে কি করবে ?

—কি আর করব। এমনিতেই জানতে চাচ্ছি।

রশীদ একটা সিগারেট ধরিয়ে, পরিতৃপ্তির সাথে বলল, জানতে চাও যখন শোনো, সেই রশীদ হলাম আমি, তোমার বাচনির সাথে আমার ছোটবেলা থেকে সম্পর্ক ছিল। তার বয়স ছিল এগার। আমার বয়স ছিল তেরো। তখন থেকে তার এবং আমার সম্পর্ক চলে আসছিল। তার কোলে তুমি যে সন্তান দেখেছ, এবং যাকে তার 'উল্লুকে পাঁঠা' স্বামী

দোলনায় দোল দিত সে এই হতভাগার সন্তান। খোদার শোকর যে, মেয়ে হয়নি, তাহলে তাকে মেরে ফেলতাম।

এই বলে রশীদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে বিদায় নিয়ে চলে গেল। মজিদ ভাবতে লাগল যে, খোদার কোন বিশেষ অনুগ্রহের কারণে রশীদ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে?

●

ফস্‌ফসি কাহিনী

প্রচণ্ড শীত। রাত দশটা বাজে। শালিমারবাগ থেকে লাহোরের দিকে যে সড়ক এসেছে সে সড়ক নির্জন এবং অন্ধকার। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বাতাস জোড়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

আশেপাশের সব জিনিস স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সড়কের দু'পাশের ছোট ছোট বাড়ীঘর এবং গাছপালা অস্পষ্ট আলোয় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হয়। বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ক্লান্ত অবসন্ন মনে হচ্ছে। চারিদিকের পরিবেশে কেমন যেন বিস্বাদে ছেয়ে আছে। শুধু প্রবল বাতাস নিজের উপস্থিতি প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

এ সময়ে দু'জন তরুণ সাইকেল চালাচ্ছে। বাতাসের ঝাপটা তাদের কানে লাগায় তারা ওভারকোটের কলার উঁচু করে দিয়েছে। উভয়ে চুপচাপ। বিপরীত বাতাসের কারণে সাইকেল চালাতে বেশ শক্তি ক্ষয় করতে হচ্ছে। প্যাডেলে জোর দিতে হচ্ছে। প্যাডেলে যে জোর দিতে হচ্ছে এ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে তারা শালিমারবাগের দিকে এগুচ্ছে। দূর থেকে কেউ তাদের দেখলে মনে করবে যে, মরিচা ধরা চাদরের মত প্রসারিত রাস্তা আরোহীদের চাকার নীচ দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে পিছিয়ে পড়ছে।

নির্জন রাস্তায় উভয়ে দীর্ঘক্ষণ নীরবে সাইকেল চালালো কেউ কারো সঙ্গে কোন কথা বলল না। তারপর একজন সাইকেল থেকে নেমে মুখের হাওয়ায় ঠাণ্ডা হাত গরম করতে করতে বলল, বড্ড শীত।

তার সঙ্গী সাথে সাথে ব্রেক কষে হেসে বলল, ভাইজান সেই—সেই হুইস্কি কোথায় ?

জাহান্নামে—সারা বিকেল যেখানে নষ্ট হয়েছে সেখানে।

সম্পর্কে উভয়ে ভাই। কিন্তু ভাই হলেও শরীয়তে অপছন্দনীয় সব কাজ উভয়ে মিলে মিশে করে। সকালে উভয়ে ঠিক করে রেখেছিল যে, দুপুর দুটোয় অফিসে দুশের যে টাকা পাওয়ার কথা, সে টাকা অফিস

থেকে বেরিয়ে কিভাবে কাজে লাগাবে সেটা তখন ভেবে দেখবে।

দু'টো বাজার আগেই টাকা পাওয়া গিয়েছিল। কারণ যে লোক ঘুষ দেবে সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। বড় ভাই টাকা পকেটে রাখার সময়ে নোটগুলো ভাল করে দেখে নিয়েছিল। টাকা বেশী ছিল না, দুশো এক টাকা। তারা দুশো টাকা চেয়েছিল কিন্তু ঘুষ প্রদানকারী নিশ্চিন্ততা বোধ করার জন্য আরো এক টাকা বাড়িয়ে দিয়েছিল। হীরামণ্ডি যাওয়ার পথে ছোট ভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী বড় ভাই সেই এক টাকা একজন অন্ধ ভিখারিণীকে প্রদান করেছে।

ছোট ভাই-এর পকেটে স্কচ-এর বোতল। বড় ভাই-এর পকেটে দু'প্যাকেট থ্রি-ক্যাসার। সাধারণত উভয়ে গোল্ড ফ্লেক পান করে কিন্তু ঘুষ পেলে বেশী দামের ব্রাণ্ড পান করে।

হীরামণ্ডিতে প্রবেশ করতে যাবে এমন সময় বাদশাহী মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে এলো। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলল, ইয়ার, নামাজ পড়ে আসি।

ছোট ভাই নিজের ফাঁপা পকেটের প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, এটার কি করব ভাইজান?

বড় ভাই কিছুক্ষণ ভেবে বলল, ওটার ব্যবস্থা করছি, বন্ধু বাট তো রয়েছে।

কাছেই ছিল পান দোকানদার বাট-এর দোকান। ছোট ভাই মিহিন কাগজে জড়ানো বোতল তার হাতে দিল। বড় ভাই উভয়ের সাইকেল দোকানের সাথে হেলান দিয়ে রেখে বাটকে বলল, এক্ষুণি নামাজ পড়ে আসছি।

বাট অট্টহাসি হেসে বলল, দু'রাকাত নফল শোকরানাও।

দু'ভাই বাদশাহী মসজিদে নফল শোকরানাসহ নামাজ আদায় করলো। ফিরে এসে দেখে বাট-এর দোকান বন্ধ। পাশের দোকানীকে জিজ্ঞেস করায় বলল, নামাজ পড়তে গেছে।

উভয় ভাই অবাক হয়ে বলল, নামাজ?

দোকানী বলল, বছরে ছ'মাস কখনো কখনো পড়ে।

উভয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলো, কিন্তু বাট-এর দেখা নেই। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলল, যাও ইয়ার, আরো এক বোতল নিয়ে এসো। আমি অনর্থক হারামজাদা বাট-এর উপর বিশ্বাস রেখেছি।

ছোট ভাই টাকা হাতে নিয়ে বড় ভাইকে বলল, পকেটে পড়ে থাকলেই বা কি ক্ষতি হতো ?

—রাখো ইয়ার! এ কাহিনী বাদ দাও। বোতল গেছে বলে আমি আফসোস করি না, কোথাও পড়ে ভেঙ্গেও যেতে পারতো। আফসোস হলো হতভাগা বড় নির্মমভাবে পান করে থাকবে।

ছোট ভাই প্যাডেলে পা রেখে বলল, আপনি এখানেই থাকবেন ?

বড় ভাই বিরক্তির সাথে বলল, হাঁ ভাই, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। সে এসেও পড়তে পারে, কিন্তু তুমি তাড়াতাড়ি এসো।

ছোট ভাই তাড়াতাড়ি এসে পড়ল। চেহারা মলিন। তার সাথে সাইকেলের কেরিয়ারে একটি লোক বসে আছে। তাগড়া জোয়ান। নিশ্চয়ই কোন গোলমাল হয়েছে। কিন্তু তাকে বেশীক্ষণ মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হলো না। ছোট ভাই সাইকেল থেকে নেমে সব ঘটনা ব্যক্ত করলো।

মদের দোকান থেকে দ্বিতীয় বোতল ক্রয় করে বাইরে বেরোবার সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হলো। তাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। দ্রুত সাইকেলে উঠতে গিয়ে সাইকেল সহ পিছলে রাস্তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল। দ্বিতীয় বোতল জাহান্নামে গেল।

ছোট ভাই সবিস্তারে সব ঘটনা ব্যক্ত করে বলল, আমি বেঁচে গেছি ভাইজান, বোতলের কোন টুকরো যদি কাপড় ভেদ করে গোশতের মধ্যে গেঁথে যেতো তা হলে এখন কোন হাসপাতালে পড়ে থাকতে হতো।

মদের দোকান থেকে যে লোকটি ছোট ভাইয়ের সাথে এসেছিল তার হাতে তৃতীয় বোতল কেনার টাকা দিয়ে বড় ভাই বাট-এর পান দোকানের দিকে তাকাল এবং মারাত্মক গালি দিয়ে দোকানকে ভস্ম করে ফেলল।

উভয়ের জানা ছিল যে তাদের কোথায় যেতে হবে। চক-এর ওদিকে

নান কাবাবওয়ালার ওপরে যে কক্ষ রয়েছে সেখানে উভয়ের বাড়তি উপার্জনের সৎকার করা হতো। পরিচারিকা মেয়েটি ছিল স্বল্পভাষী, খাটা-খাটুনিতে অভ্যস্ত। স্বভাবের দিক থেকে তাকে দেখে পতিতা এক নারী বলেই মনে হয়। মেয়েটিকে তারা এ কারণে পছন্দ করতো। উভয়ে খুব বেশী পরিমাণে পান করলে অফিসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ জমাতো। হেড ক্লার্ক কেমন, সাহেব কেমন, তার গৃহকর্ত্রীর মন-মেজাজ কেমন, তাদের চেয়ে অধঃস্তন কর্মচারীদের অতীত এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে গভীর পর্যালোচনা চলতে থাকতো। একজন বলতো অন্যজন মনোযোগ সহকারে শুনতো।

পরিচারিকা মেয়েটির কণ্ঠ মিষ্টি, সুরেলা। উভয় ভাই তার গানে নেশাগ্রস্তের মত ঢুলু ঢুলু করতো, মনে হতো তাদের কানে যেন মধুবর্ষণ করা হচ্ছে। কিন্তু আজ মেয়েটি গাইতে শুরু করলে তাদের উভয়ের মনে হলো আজকের গানে তাল সুর কিছু নেই। এজন্যে গান বন্ধ করিয়ে উভয়ে বাকি মদ পান করতে শুরু করলো।

পতিতা পরিচারিকা মেয়েটির নাম শিদান। সে খুবই মদ পান করতো। কিন্তু আজ তার কি হয়েছে কে জানে। দু' ভাই তার গান বন্ধ করিয়ে দেয়ার পর সে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল এবং এক বোতল তুলে সব মদ একাই খেয়ে ফেলল।

বড় ভাই-এর খুব রাগ হলো, কিন্তু সে রাগ হজম করলো। কারণ ছোট ভাই বেশ আনন্দে ছিল। কিন্তু তাও বেশীক্ষণ নয়, আরো পান করার জন্যে সে বোতল উঠিয়ে দেখে বোতল খালি পড়ে আছে। তখন দু'ভাই একত্রেই কুপিত বোধ করল।

বড় ভাই ছোট ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করল না। শিদানের ওস্তাদ মাগুকে টাকা দিয়ে বলল, যাও, তাড়াতাড়ি যাও, আরো এক বোতল জিমখানা হুইস্কি নিয়ে এসো।

ওস্তাদ টাকা গুণে পকেটে রেখে বলল, সরকার! কালোবাজারে পাওয়া যাবে।

ত্যক্ত বিরক্ত বড় ভাই উচ্চস্বরে বলল, হাঁ হাঁ জানি, এজন্যেই

তো পাঁচ টাকা বেশী দিয়েছি।

জিমখানা এলো। বড় ভাই অনুভব করলো যে, পানি মেশানো হুইস্কি। পরীক্ষা করার জন্যে সে একটুখানি রেকাবিতে ঢেলে দিয়াশলাই জ্বালিয়ে তাতে লাগালো। ক্ষণিকের জন্যে নীল নীল ধোঁয়া উঠে দিয়াশলাই-এর কাঠি শোঁ শোঁ করে রেকাবিতে নিভে গেল।

উভয়ে কুপিত বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লো। বড় ভাইয়ের হাতে পানি মেশানো বোতল। তার ইচ্ছে ছিল বেঈমান মদ বিক্রেতার মাথায় বোতল ছুঁড়ে মারবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যে, তাদের কাছে পারমিট নেই, এজন্যে বাধ্য হয়ে গালাগালি করেই চুপ করে রইলো।

ছোট ভাইয়ের চেষ্টায় বিরক্তি ভাব অনেকটা কেটে গেল। তাদের সেবিকা শিদান পানাহার করা সবকিছু উদগীরণ করতে শুরু করলো। উভয়ে ভাবলো, কেটে পড়া যাক। ওস্তাদের জিম্মা থেকে সাইকেল নিয়ে তখন উভয়ে হীরামণ্ডির গলিতে দীর্ঘ সময় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরাঘুরি করলো, কিন্তু এতেও তাদের কুপিতভাব পুরোপুরি কাটেনি। ঘরে ফিরে যাবে ভাবছিল, এমন সময় বাট-এর সাথে হঠাৎ দেখা। নেশায় চুর হয়ে আবাসিক ভবনগুলোর ওপরের দিকে তাকিয়ে অশ্লীল সব বকাবকি করছিল। এগিয়ে যেয়ে ব্যাটাকে উত্তম-মধ্যম দেয়ার জন্যে উভয় ভাইয়ের ইচ্ছে হলো। কিন্তু তার আগেই একটা পুলিশ এসে তাকে ধরে থানায় নিয়ে গেল।

ছোট ভাই বড় ভাইকে বলল, চলুন ভাইজান, একটু তামাশা দেখে আসি।

বড় ভাই জিজ্ঞেস করল, কার?

—বাটের, আর কার?

বড় ভাইয়ের অধরে অর্থব্যঞ্জক হাসি ফুটে উঠল। বলল, পাগল হয়েছ? থানায় যদি আমাদের চিনে ফেলে, অথবা কেউ মুখের ঘ্রাণ শুঁকতে পায় তা হলে সংগে সংগে নিজেদেরকে নিজেদের তামাশা দেখতে হবে।

ছোট ভাই বড়-ভাই এর দূরদর্শিতার মনে মনে প্রশংসা করে বলল,

চলুন, তাহলে বাসায় চলুন।

উভয়ে নিজ নিজ সাইকেলে আরোহণ করল। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাস জোরে জোরে বইছিল। হীরামণ্ডি ছেড়ে যাওয়ার আগেই তারা সামনের একটা টাঙ্গায় তাদের অফিসের বড় সাহেবকে দেখতে পেলো। উভয়ে তার দৃষ্টি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। বড় সাহেব তাদের দেখে ফেলেছিলেন।

—হ্যালো!

তারা এ হ্যালোর কোন জবাব দিল না।

—হ্যালো!

এ হ্যালোর জবাবে তারা নিজ নিজ সাইকেল থামিয়ে ফেলল। সাহেব টাঙ্গা থামিয়ে মুরুব্বিয়ানা ঢং-এ বললেন, বল, মিস্টার, খুব আয়েশ করছ?

ছোট ভাই 'জী হাঁ' এবং বড় ভাই 'জী না' বলে জবাব দিল। এ কথা শুনে বড় সাহেব উচ্চস্বরে হেসে বললেন, আমার আয়েশ তো অপূর্ণ রয়ে গেল। তারপর তিনি বড় সাহেবসুলভ ভঙ্গিতে বললেন, তোমাদের কাছে কিছু টাকা হবে?

এ প্রশ্নের জবাবে বড় ভাই বলল, 'জী হাঁ'। ছোট ভাই বলল, 'জী না'।

বড় সাহেব এ জবাব শুনে নিজস্ব ভঙ্গিতে হেসে বললেন, এ সময়ে একশত টাকাই যথেষ্ট হবে।

বড় ভাই নাটকীয় ভঙ্গিতে পকেট থেকে একশত টাকার নোট বের করে ছোট ভাইয়ের হাতে দিল। ছোট ভাই বড় সাহেবের হাতে দিতেই তিনি 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে টাঙ্গা থেকে নামলেন এবং এলোমেলো পায়ে একদিকে চলে গেলেন।

উভয় ভাই কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বড় ভাই বলল, জানি না, আজ সকালে কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম।

ছোট ভাই একটা মোটা গালি উচ্চারণ করে বলল, ওই ব্যাটার,

যে কিনা দুশো এক টাকা দিয়েছিল।

বড় ভাইও মোটা সমীচীন গালির সাথে তাকে স্মরণ করে বলল, ঠিক বলেছ। কিন্তু আমার মনে হয় সব দোষ ঐ অবৈধ উপায়ে অর্জিত টাকার।

– সেই নামাজেরও।

—সেই হারামি বাট-এরও।

—পুলিশ তাকে গ্রেফতার করায় আমি পুলিশের কাছে কৃতজ্ঞ। গ্রেফতার না করলে আমি আজ তাকে নির্ঘাত খুন করে ফেলতাম।

—আর হাঁ, নিলে কিন্তু দিতেও হয়।

—নিয়ে তো দিতে হলোই। খোদাই জানেন, আমাদের এই বড় সাহেব কোথা থেকে এলেন!

—কিন্তু আমি মনে করি ভালোই হয়েছে। একশত টাকায় শালাকে ঋণী করতে পেরেছি।

—তা ঠিক, কিন্তু আজকের সন্ধ্যাটা বড় বিশ্রীভাবে মাটি হয়ে গেল।

—চল, এখন ফেরা যাক। আবার কোন আপদ এসে পড়ে কে জানে।

উভয়ে নিজ নিজ সাইকেলে আরোহণ করে হীরামণ্ডি থেকে বেরিয়ে এলো।

বড় ভাই অফিস থেকে বেরিয়েই মনে মনে স্থির করে রেখেছিল যে, স্কচের দু'তিন পালা শেষ হবার পর সে শিদানকে বলবে, শিদান যেন তার ছোট বোনকে ডেকে নিয়ে আসে। শিদান ছোট বোনের খুবই প্রশংসা করে। গ্রামের স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সে জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছে। কয়েক মাস হলো সে ধান্দা শুরু করেছে।

স্কচ হুইস্কি এবং ছোট বোন। এর চেয়ে চমৎকার আনন্দ আর কি হতে পারে। কিন্তু তার সব পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে গেছে, এখন বাকি আছে শুধু একরাশ তিক্ততা।

ছোট ভাইও আজকের সন্ধ্যার কর্মসূচী আগেই তৈরী করে রেখেছিল। আনন্দঘন মওসুম। হুইস্কি এবং শিদান তাকে আরো আনন্দে ভরপুর

করে তুললো। তৃপ্তিকর এ স্মৃতির কারণে দশ-পনেরো দিন অন্য কোন আনন্দের তার প্রয়োজনই অনুভূত হতো না। কিন্তু সব কিছু বরবাদ হয়ে গেল।

উভয়ের মাথা ভারি এবং মন বিষণ্ন হয়ে উঠেছিল। উভয়ের সব ইচ্ছা বিপরীত ধারায় প্রবাহিত হলো। হুইস্কির প্রথম বোতল পান বিক্রেতা বাট নিয়ে পালালো। দ্বিতীয় বোতল রাস্তায় পড়ে ভেঙ্গে গেল। আনন্দঘন পরিবেশে তৃতীয় বোতল একরাশ তিক্ততা ছিটিয়ে দিল। চতুর্থ বোতলে ছিল অর্ধেক পানি। আবার একশত টাকার নোটটা বড় সাহেব হাতিয়ে নিলেন।

বড় ভাই-এর বিরক্তির মাত্রা অত্যন্ত বেশী। এ কারণে তার মাথায় অদ্ভুত সব চিন্তা ভিড় করছিল। সে চাচ্ছিল আরো কিছু হোক, এমন কিছু হোক যাতে তারা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করতে পারে। অথবা সাইকেল ভেঙ্গে চুরমার করতে পারে। সব জামা-কাপড় খুলে ফেলে নগ্নদেহে কোন কুয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। পরিস্থিতি তাদের সাথে যেমন রসিকতা করেছে তেমনি তারাও পরিস্থিতির সাথে রসিকতা করতে চায়। কিন্তু মুশকিল হলো সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে সেই হীরামণ্ডিতেই মৃত্যুবরণ করেছে। এখন ইচ্ছামত বিদ্রূপ এবং রসিকতা করার মতো পরিস্থিতি কি করে সৃষ্টি করা যায় এটা তারা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না।

একটা হলো নিজের বাড়ী। সেখানে গিয়ে তারা লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু শুধু শুধু লেপের তলায় শুয়েই বা কি লাভ। এর চেয়ে একশত টাকার দুটো নোট দিয়ে চরস মাখানো তামাক কিনে পান করে বুঁদ হয়ে থাকা ভালো। তারপর সকাল বেলায় কোন পীর ফকিরের মাজারে এক টাকা দান করবে।

এসব ভাবতে ভাবতে বড় ভাই উচ্চস্বরে বলল, ধুত্তুরি ছাই তোর—।

ছোট ভাই ভয়ে ভয়ে বলল, পাংচার হয়ে গেছে?

—আরে না না ইয়ার। আমি নিজের দেমাগ পাংচার করতে শুরু করেছিলাম।

—এবার তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরা দরকার।

বড় ভাই চরম বিরক্তির সাথে বলল, ওখানে গিয়ে করবোটা কি? টিয়ে পাখীর বাল কামাবো?

ছোট ভাই হাসতে লাগলো। এ হাসি বড় ভাইয়ের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল। বলল, চুপ কর মিয়া!

দীর্ঘ সময় উভয়ে নিজেদের বাড়ীর বিপরীত দিকে চললো। এখন তারা লোহার মরিচা ধরা প্রসারিত সড়ক যা কিনা সাইকেলের চাকায় বিলীন হচ্ছিল সেই সড়ক ধরে এগুচ্ছে।

বড় ভাই ঠাণ্ডা হাত মুখের গরম বাতাসে গরম করে বলল, প্রচণ্ড শীত।

ছোট ভাই রসিকতা করে বলল, ভাইজান, সেই হুইস্কি কোথায় গেছে?

বড় ভাই-এর ইচ্ছে হলো ছোট ভাইকে সাইকেল সহ তুলে রাস্তায় আছাড় দিয়ে ফেলে দেয়। কিন্তু তা না করে মুখে শুধু বলল, জাহান্নামে—যেখানে পুরো সন্ধ্যা বরবাদ হয়েছে, সেখানে। এই বলে সে বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগল। এমন সময় ছোট ভাই উচ্চস্বরে বলল, ভাইজান, ওই দেখুন, কে আসছে?

বড় ভাই তাকিয়ে দেখল, একটা মেয়ে শীতে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তা হাতড়াতে হাতড়াতে তার দিকে আসছে। কাছে এলে সে দেখল, মেয়েটি অন্ধ। চোখ খোলাই আছে, কিন্তু চোখে জ্যোতি নেই। মেয়েটি বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল।

বড় ভাই ভালো করে তাকিয়ে দেখল, মেয়েটি যুবতী। বয়স ষোল-সতের বছরের কাছাকাছি। ছেঁড়া পুরোনো কাপড় ভেদ করে তার যৌবন উঁকি দিচ্ছে। ছোট ভাই তাকে জিজ্ঞেস করল, তুই কোথায় যাচ্ছিস?

অন্ধ মেয়েটি কাঁপতে কাঁপতে বলল, পথ ভুলে গেছি। ঘর থেকে আগুন নেয়ার জন্যে বেরিয়েছিলাম।

বড় ভাই জিজ্ঞেস করল, কোথায় তোর ঘর?

অন্ধ মেয়েটি বলল, জানি না। পেছনে কোথাও ছেড়ে এসেছি।

—চল আমার সঙ্গে। বড় ভাই মেয়েটিকে হাত ধরে রাস্তার ওপাশে পুরোনো ইটের ভাটায় নিয়ে গেল। সেখানে পুরোনো ইট ইতস্তত: ছড়িয়ে

আছে। মেয়েটি বুঝতে পারল, পথ-প্রদর্শনকারী তাকে পথ দেখানোর নাম করে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে কোন প্রতিবাদ করল না। সম্ভবতঃ এ পথে সে আরো কয়েকবার চলাচল করেছে।

বড় ভাই খুশী হলো। ভাবলো, যাক কুপিত ভাব দূর করার উপকরণ পাওয়া গেছে। কারো হস্তক্ষেপের আশংকা নেই। ওভারকোট খুলে সে মাটিতে বিছিয়ে দিল। তারপর উভয়ে বসে কথা বলতে লাগল।

মেয়েটি জন্ম অন্ধ ছিল না। দাঙ্গার আগে সে দেখতে পেতো। শিখরা তাদের গ্রামে হামলা করার পর ছুটোছুটি করার সময়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগায় তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বড় ভাই মৌখিক সমবেদনা প্রকাশ করল। মেয়েটির অতীতের প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। দুটো টাকা বের করে মেয়েটির হাতে দিয়ে বলল, মাঝে মাঝে দেখা করো, আমি তোমাকে কাপড় কিনে দেব।

মেয়েটি খুব খুশী হলো। বড় ভাই উজ্জ্বল চোখে এবং সক্রিয় হাতে মেয়েটিকে প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত হলো। বিরক্তি কুপিত ভাব অনেকাংশে কেটে গেল। হঠাৎ ছোট ভাই ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, ভাই ভাই,—ভাইজান!

বড় ভাই জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

ছোট ভাই কাছে এসে ভয়াতুর স্বরে বলল, দু'জন পুলিশ আসছে।

বড় ভাই ভয় পেল না, বুদ্ধি-বিবেক ঠিক রেখে ওভারকোট জোরে টান দিল। মেয়েটি ছিটকে পড়ে চীৎকার করে উঠলো। ততক্ষণে উভয় ভাই ছুটে পালালো।

চীৎকার শুনে পুলিশ দু'জন দ্রুত এগিয়ে এসে সংজ্ঞাহীন অন্ধ মেয়েটিকে উপরে তুলল। তার মাথা থেকে রক্ত ঝরছিল। কিছুক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরে এলে সে পুলিশদের প্রতি এমনভাবে তাকালো যেন ভূত দেখতে পাচ্ছে—আমি দেখতে পাচ্ছি—আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে।

এই বলে মেয়েটি এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। তার হাতে ধরা টাকা দুটো পুলিশ দু'জন আগেই নিয়ে গেছে।

●

মাহমুদা

মুস্তাকিম মাহমুদাকে প্রথম দেখেছিল নিজের বিয়ের সময়ে। কনে সঁপে দেয়া অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে সে অস্বাভাবিক রকমের বড় বড় দু'টি চোখ দেখতে পেল। মাহমুদা কুমারী, তখনো তার বিয়ে হয়নি।

মহিলা এবং কমবয়েসী মেয়েদের মধ্যে ঘেরাও অবস্থায় কনে সঁপে দেয়া অনুষ্ঠানে মাহমুদার দু'টি চোখ দেখার পর মুস্তাকিম বুঝতে পারল না যে অনুষ্ঠান কখন শেষ হয়েছে। নববধূ কেমন, তাকে মন্তব্যের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মাহমুদার চোখ কনে এবং মুস্তাকিমের মধ্যে একটা কালো মিহিন পর্দার মত অন্তরায় হয়ে গিয়েছিল।

চুপিসারে মুস্তাকিম কয়েকবার মাহমুদার প্রতি তাকালো। সমবয়েসী মেয়েদের মধ্যে মাহমুদাও নানা রকম ঠাট্টা মশকারা করছিল। মুস্তাকিমকে ঘিরে সবাই উল্লাস প্রকাশ করছিল। কিন্তু মুস্তাকিম জানালার পাশে চুপ-চাপ বসে রইল।

মাহমুদার গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। স্লেটের রং-এর মতো কালো চকচকে চুল। মায়াবী আকর্ষণীয় চেহারা। মুস্তাকিমের ধারণা ছিল যে, সে খুব বেশী লম্বা হবে না। মাহমুদা উঠে দাঁড়ালে এর সত্যতা প্রমাণিত হলো।

সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদ। দেহের ওড়না পড়ে গেলে মুস্তাকিম দেখল মাহমুদার বুক বেশ উন্নত এবং মজবুত। ভরাট দেহ, টিকলো নাক, চওড়া ললাট, ছোট ঠোঁট, আর দু'টি চোখ যা সর্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর হয়।

মুস্তাকিম বউ নিয়ে বাড়ীতে এলো। দু'তিন মাস কেটে গেছে। সে বেশ সুখী ছিল। কারণ তার বউ সুন্দরী এবং সপ্রতিভ। কিন্তু মুস্তাকিম মাহমুদার চোখ দুটো কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। সে দু'টি চোখ যেন তার মন-মানসে ছেয়ে আছে।

মুস্তাকিম মাহমুদার নাম জানতো না। একদিন সে তার স্ত্রী কুলসুমকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল, আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে তোমাকে যখন

আমার হাতে সঁপে দেয়া হচ্ছিল তখন এক কোণে যে একটি মেয়ে বসেছিল তার নাম কি ?

কুলসুম জবাবে বলল, আমি কি করে বলব ? তখন তো কতো মেয়েই এসেছিল। আপনি কার কথা বলছেন কি করে বুঝব ?

মুস্তাকিম বলল, ঐ যে, যার বড় বড় চোখ ছিল।

কুলসুম বুঝে ফেলল। বলল, ওহো আপনি মাহমুদার কথা বলছেন ? আসলেই চোখ দু'টি খুব বড় বড়, কিন্তু দেখতে ভাল লাগে না। গরীব ঘরের মেয়ে, স্বল্পবাক এবং রুচিশীল। গতকালই তার বিয়ে হয়ে গেছে।

মুস্তাকিম নিজের অজ্ঞাতে চমকে উঠে বলল, কাল ওর বিয়ে হয়ে গেছে ?

হাঁ, আমি তো কাল সেখানেই গেছি। আপনাকে বলিনি যে, আমি একটা আংটি উপহার দিয়েছি।

মুস্তাকিম বলল, হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু আমি জানতাম না যে তুমি যে বান্ধবীর বিয়েতে যাচ্ছ সে ঐ মেয়েই। কোথায় বিয়ে হয়েছে ওর ?

কুলসুম পানের খিলি তৈরী করে স্বামীর হাতে দিতে দিতে বলল, নিজেদের আত্মীয়ের মধ্যেই। তার স্বামী রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজ করে, মাসিক বেতন দেড়শত টাকা। শুনেছি বেশ ভালো লোক।

মুস্তাকিম পান চিবোতে চিবোতে বলল, যাক ভালোই হয়েছে। মেয়েটিও নাকি তুমি বলছ ভালো।

কুলসুম মাহমুদার প্রতি স্বামীর এতো আগ্রহ দেখে অবাক হলো। বলল, আপনি শুধু এক নজর দেখেই ওকে মনে রেখেছেন ?

মুস্তাকিম বলল, ওর চোখ দুটোই এমন যে কেউ ওকে দেখে ভুলতে পারে না। কেমন ঠিক বলেছি না ?

কুলসুম আরো একটা পান তৈরী করছিল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না। ওর চোখে আমি তো কোন আকর্ষণ দেখি না। পুরুষরা কি রকম দৃষ্টিতে তাকায় কে জানে।

এ বিষয়ে আর কথা বাড়ানো মুস্তাকিম সমীচীন মনে করল না। কুলসুম হাসলো এবং উঠে নিজের কামরায় চলে গেল। রবিবারের ছুটি, ভেবেছিল স্ত্রীকে নিয়ে ম্যাটিনি শোতে ছবি দেখতে যাবে, কিন্তু

মাহমুদার প্রসঙ্গ এসে পড়ায় তার মন কেমন যেন ভারি হয়ে উঠল।

মুস্তাকিম ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা বই টেনে নিল। বইটি আগে সে দু'বার পড়েছিল। প্রথম পাতা খুলে পড়তে লাগল, কিন্তু প্রতিটি অক্ষর মাহমুদার চোখ হয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মুস্তাকিম ভাবল, কুলসুম সম্ভবত ঠিকই বলছে যে, মাহমুদার চোখে কোন আকর্ষণ সে দেখতে পায়নি। অন্য কোন পুরুষের চোখেও সে চোখের বিশেষত্ব হয়তো লক্ষ্যণীয় হবে না। আমার চোখেই ভাল লাগছে। কিন্তু কেন? আমি তো এমন কোন ইচ্ছা পোষণ করিনি, ওই চোখ আমার জন্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠুক এওতো আমি চাইনি। ক্ষণিকেরই তো ব্যাপার। আমি অল্প সময় এই চোখ দেখলাম অথচ তাই আমার মনে হৃদয়ে ছেয়ে গেছে। এতে ওই চোখেরও কোন দোষ নেই, আর আমি যে দেখেছি আমার চোখের কোন দোষ নেই।

তারপর মুস্তাকিম মাহমুদার বিয়ে সম্পর্কে ভাবতে লাগলো। হয়ে গেলো তাহলে তার বিয়ে? যাক ভালোই হয়েছে। কিন্তু বন্ধু তোমার বুকে মৃদু যন্ত্রণা হচ্ছে কেন? তুমি কি চাও যে তার বিয়ে না হোক, সে চিরকুমারী থাকুক? তাকে বিয়ে করার জন্যে তোমার মনে তো কখনো আকাঙ্খা জাগেনি। তুমি তার সম্পর্কে ক্ষণিকের জন্যে ভাবোনি, তাহলে এ যন্ত্রণা কেন? এতো দিন তো ওকে দেখার জন্যে তোমার আগ্রহও জাগেনি, কিন্তু এখন ওকে তুমি দেখতে চাও কেন? আচ্ছা ধরে নিলাম দেখলে, কিন্তু দেখেই বা কি করবে? ওকে তুলে নিজের পকেটে রাখবে? ওর ডাগর ডাগর চোখ খুলে পকেটে রাখবে? বলো না কি করবে?

মুস্তাকিমের কাছে এসব প্রশ্নের কোন জবাব ছিল না। আসলে সে নিজেই জানে না যে সে কি চায়। যদি কিছু চায়ও তবে কেন চায়, তাও তার জানা নেই।

মাহমুদার বিয়ে হয়ে গেছে, তাও একদিন আগে। মুস্তাকিম যখন বই পড়ছে মাহমুদা তখন নিশ্চয়ই কনে সেজে হয় তো পিত্রালয়ে অথবা শ্বশুরালয়ে বসে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে আছে। সে অত্যন্ত ভালো মেয়ে, তার স্বামীও নাকি ভালো লোক, রেলওয়ের ওয়ার্কশপে চাকরী করে, দেড়শত

টাকা মাসিক বেতন—খুবই খুশীর কথা। মুস্তাকিমের আন্তরিক ইচ্ছা জাগে মাহমুদা সুখে থাকুক, সারা জীবন সুখে থাকুক। কিন্তু সাথে সাথে একটা দুঃখ বোধ, একটা চাপা যন্ত্রণা কেন তাকে অস্থির করে তোলে কে জানে।

শেষ পর্যন্ত মুস্তাকিম এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে, এসব আসলে বাজে ভাবনা। মাহমুদা সম্পর্কে মোটেই চিন্তা করা উচিত নয়।

দু'বছর কেটে গেল। এ সময়ে মুস্তাকিম মাহমুদা সম্পর্কে কোন কিছু জানেনি, জানার চেষ্টাও করেনি। অথচ মাহমুদা এবং তার স্বামী বোম্বের ডুংগ্রীর একটা গলিতে থাকে। মুস্তাকিম যদিও ডুংগ্রী থেকে অনেক দূরে সাহেমে থাকে তবু ইচ্ছে করলেই সে মাহমুদাকে দেখে আসতে পারে।

একদিন কুলসুম বলল, আপনার সেই ডাগর চোখ মেয়েটির কপাল মন্দ প্রমাণিত হয়েছে।

মুস্তাকিম উদ্বেগজনকভাবে বলল, কেন? কি হয়েছে?

কুলসুম পান সাজাতে সাজাতে বলল, তার স্বামী একেবারে মৌলবী হয়ে গেছে।

—তাতে কি হয়েছে?

—আপনি আগে তো শুনুন। সব সময় সে লোক-ধর্মের কথা বলে, কিন্তু বড় উদ্ভট সেসব কথা। ওজিফা পড়ে, চিল্লা দেয়, এবং মাহমুদাকে অনুরূপ করতে বাধ্য করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফকিরদের কাছে বসে থাকে। ঘর-সংসার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। দাড়ি বাড়িয়ে নিয়েছে, হাতে সবসময় তসবীহ থাকে। কখনো কাজে যায়, কখনও যায় না। কয়েক দিন পর্যন্ত বাসায় আসে না। বেচারী জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়। ঘরে খাবার থাকে না, বলে উপোস করতে হয়। অভিযোগ করলে জবাব দেয়, উপোস থাকা আল্লাহতায়ালা খুবই পছন্দ করেন।

কুসুম এক নিঃশ্বাসে সব কথা বলল।

মুস্তাকিম পানদান থেকে কিছুটা মশলা মুখে দিয়ে বলল, কেন, মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

কুলসুম জবাব দিল, মাহমুদারও তাই ধারণা। ধারণাই বলি কেন, বিশ্বাস বলা যায়। গলায় মোটা মালা পরিধান করে, কখনো আবার সাদা

ধবধবে পোষাক পড়ে থাকে।

মুস্তাকিম সেজে দেয়া পান নিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে ইজি-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, একি হলো—এরকম স্বামী তো মহাসংকট ছাড়া কিছু নয়। হতভাগিনী কি প্রাণান্তকর বিপদে পড়েছে। মনে হয়, পাগলপনার বীজ তার স্বামীর মধ্যে আগে থেকেই বিদ্যমান ছিলো, যা কিনা এখন নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মাহমুদা এখন কি করবে? এখানে তার কোন আত্মীয়-স্বজনও নেই, বিয়ের সময় কয়েকজন আত্মীয় লাহোর থেকে এসেছিলেন, তারা আবার চলে গেছেন। মাহমুদা কি নিজের ভাগ্যের কথা পিতা-মাতাকে লিখেছে? না না, কুলসুমই তো একবার বলেছিল যে তার পিতা-মাতা মাহমুদার শৈশবেই মারা গেছেন। তার চাচা বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। ডুংগীতে সম্ভবতঃ চেনা পরিচিতের মধ্যে কেউ ছিল। না, চেনা পরিচয়ের মধ্যে কেউ হলে মাহমুদাকে উপোস কেন করতে হচ্ছে? মাহমুদাকে কুলসুমও তো এখানে নিয়ে আসতে পারতো, কই তাও তো আনলো না। আরে তুমি কি পাগল হয়েছ মুস্তাকিম, একটু বিবেক বুদ্ধি কিছু খরচ করো।

মুস্তাকিম নিজের মনকে আবার শক্ত করলো যে, মাহমুদা সম্পর্কে সে কিছু চিন্তা করবে না। কারণ এতে তার কোন লাভ হবে না, শুধু শুধু মগজ খরচ করছে।

বেশ কিছুদিন পর কুলসুম জানালো যে, মাহমুদার স্বামী বলতে গেলে পাগল হয়ে গেছে।

মুস্তাকিম জিজ্ঞেস করল, তার মানে?

জবাবে কুলসুম বলল, মানে, এখন রাতে মুহূর্তের জন্যে ঘুমোয় না, যেখানে দাঁড়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়েই থাকে। হতভাগিনী মাহমুদা কেঁদে আকুল হয়। গতকাল আমি তার কাছে গিয়েছিলাম, দেখি কয়েকদিন উপোস। আমি তাকে বিশ টাকা দিয়ে এসেছি। আমার কাছে তখন বিশ টাকাই ছিলো।

মুস্তাকিম বলল, খুব ভাল করেছ। ওর স্বামী সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে কিছু দিয়ে এসো। হতভাগিনী তা হলে অন্তত অনাহার থেকে

রক্ষা পাবে।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর কুলসুম বলল, আসল ব্যাপার অন্য কিছু।

—তার মানে ?

—মাহমুদার ধারণা, জামিল আসলে একটা ঢং করছে, সে পাগল-টাগল কিছু নয়। কথা হলো গিয়ে সে···

—সে কি ?

—সে—সে মেয়েদের উপযুক্ত নয়। এই অক্ষমতা দূর করার জন্যে ফকির-সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে টোনা তাবিজ নেয়।

—এটা যদি হয় তাহলে তো পাগল হওয়ার চেয়েও দুঃখজনক ব্যাপার। মাহমুদার দাম্পত্য জীবন তো তাহলে শূন্যতায় ভরে আছে।

মুস্তাকিম নিজের কামরায় গিয়ে মাহমুদার ভাগ্য বিড়ম্বনা সম্পর্কে ভাবতে লাগলো। যে মেয়ের স্বামী নপুংসক তার দাম্পত্য জীবনের দাম কিছু নেই। কত আশা ছিলো তার বুকে, তার যৌবন কত লজ্জা-স্বপ্ন দেখে থাকবে, অথচ হতভাগিনী কি রকম ব্যর্থ হয়েছে। নিজের চারদিকে দেখছে অপরিসীম শূন্যতা। নিজের কোল ভরে ওঠা সম্পর্কে কতোবার হয়তো ভেবেছে। ডুংগ্রীতে কারো ঘরে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ে তার বুকে কী ভীষণ আঘাত পায়। এখন সে কি করবে—আত্মহত্যা করে কিনা কে জানে। দু'বছর পর্যন্ত সে এ গোপন কথা কাউকে বলেনি, অথচ তার বুক ফেটে গেছে। খোদা তাকে রহমত করুন।

আরো কিছুদিন পর। মুস্তাকিম এবং কুলসুম পঞ্চগনিতে ছুটি কাটাতে গেল। ওখানে আড়াই মাস কাটল। ফিরে আসার একমাস পর কুলসুমের সন্তান হলো। কুলসুম, এর মধ্যে মাহমুদার বাড়ীতে যেতে পারেনি। সন্তান হবার পর খবর পেয়ে মাহমুদার এক বান্ধবী কুলসুমকে এক শুভ কামনা জানাতে এলো। কথায় কথায় সে কুলসুমকে জানালো, কিছু শুনেছ তুমি—সেই মাহমুদা, সেই ডাগর ডাগর যার চোখ·····

কুলসুম বলল, হাঁ হাঁ, ডুংগ্রীতে থাকে।

—স্বামীর উদাসীনতা হতভাগিনীকে খারাপ কাজে বাধ্য করেছে। কুলসুমের বান্ধবীর কণ্ঠে বেদনার সুর।

কুলসুম ভগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কি রকম খারাপ কাজে ?

—ওর কাছে এখন বাইরের পুরুষরা যাওয়া আসা করে।

—মিথ্যে কথা। কুলসুমের বুক ধক ধক করতে লাগলো।

—না কুলসুম, গত পরশু আমি মাহমুদার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দরজায় টোকা দেয়ার কিছুক্ষণ পর একটা যুবা পুরুষ বাইরে বেরিয়ে দ্রুত নীচে নেমে গেল। আমি মাহমুদার সাথে দেখা করা সমীচীন মনে করলাম না ফিরে এলাম।

কুলসুম নিজেকে প্রবোধ দেয়ার মত করে বলল, তুমি বড় খারাপ খবর শুনেছ। খোদা তাকে পাপের পথ হতে রক্ষা করুন। সে লোক মাহমুদার স্বামীর কোন বন্ধুও তো হতে পারে।

কুলসুমের বান্ধবী হেসে বলল, বন্ধু চোরের মত দরজা খুলে পালিয়ে যায় না।

কুলসুম তার স্বামীকে এসব জানালে মুস্তাকিম খুবই দুঃখিত হলো। কুলসুম তার স্বামীকে কখনো কাঁদতে দেখে নি, কিন্তু এখন দেখল মাহমুদার কথা শুনে তার চোখে অশ্রু দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে সিদ্ধান্ত নিলো যে, মাহমুদা এখানে থাকবে। মনে মনে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে কুলসুমকে বলল, এ বড় ভয়ানক সংবাদ। তুমি এক কাজ করো। এখনি যাও মাহমুদাকে এখানে নিয়ে এসো।

কুলসুম রুক্ষস্বরে বলল, ওকে আমি নিজের ঘরে রাখতে পারব না।

—কেন ? মুস্তাকিমের কণ্ঠে বিস্ময়।

কুলসুম দৃঢ়তার সাথে বলল, ব্যস, আমার ইচ্ছা। সে আমার এখানে থাকবে কেন ? তার চোখ দুটি আপনার খুব পছন্দ, এজন্যে ?

মুস্তাকিমের খুব রাগ হলো, কিন্তু নিজেকে সংযত করলো। কুলসুমের সাথে তর্ক করা বৃথা। একটা কাজ করতে পারে, কুলসুমকে বের করে দিয়ে মাহমুদাকে এনে ঘরে তুলতে পারে। কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপের কথা চিন্তাই করা যায় না। মুস্তাকিমের উদ্দেশ্য ছিল আসলেই মহৎ, এ সম্পর্কে সে ছিল সম্পূর্ণ সচেতন। মাহমুদাকে সে নোংরা দৃষ্টিতে দেখেনি, তবে তার চোখ দুটি মুস্তাকিমের খুবই পছন্দনীয় ছিল। এতো বেশী পছন্দ যে ভাষায়

প্রকাশ করা তা সম্ভব নয়।

মাহমুদা পাপের পথে পা বাড়িয়েছে। তবে অল্প কয়েক কদম এগিয়েছে মাত্র। তাকে ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে রক্ষা করা সম্ভব। মুস্তাকিম কখনো নামাজ পড়েনি, রোজা রাখেনি, কখনো দান-খয়রাতও করেনি। মাহমুদাকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে তার সামনে চমৎকার সুযোগ রয়েছে। তালাক আদায় করে অন্য কারো সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারে, অথচ সে এ পুণ্যের কাজ ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর কারণে করতে পারছিল না।

মুস্তাকিম নিজের সাথে অনেক বোঝাপড়া করলো। স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করেও কোন ফল পেল না।

মুস্তাকিম ভেবেছিল, অন্য কিছু না হোক, অন্তত কুলসুম মাহমুদার সাথে সাক্ষাৎ তো করতে যাবে, কিন্তু সে হতাশ হলো। সেদিনের পর থেকে কুলসুম কখনো মাহমুদার নামও মুখে আনেনি।

কি আর করা যায়, মুস্তাকিম চুপচাপ রইল।

প্রায় দু'বছর পরের কথা। একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে মুস্তাকিম ফুটপাথে পায়চারি করছিল। কসাইদের বিল্ডিং-এর নীচ তলার একটা কামরায় সে মাহমুদার দু'টি চোখ দেখতে পেল। কিছুদূর এগিয়ে সে ভালো করে লক্ষ্য করলো, হাঁ মাহমুদাই। সেই বড় বড় চোখ। মাহমুদা এক ইহুদী মহিলার সাথে কথা বলছিল।

মাহমের প্রায় সবাই ইহুদী মহিলাটিকে জানে। মহিলা বয়সের দিক থেকে প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি পৌঁচেছে। সে আরামপ্রিয় পুরুষদের জন্যে যুবতী মেয়ে সরবরাহ করে। নিজের দু'টি মেয়েকে সে পতিতা বৃত্তিতে লাগিয়ে দিয়েছে। মাহমুদার চেহারায় অহেতুক মেক-আপ দেখে মুস্তাকিম কেঁপে উঠলো। এ দুঃখজনক ব্যাপার সে বেশীক্ষণ দেখতে পারল না। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে গেল।

কুলসুমের সাথে এ ব্যাপারে সে কোন কথাই বলল না। কারণ এখন তার কথা বলার প্রয়োজন নেই। মাহমুদা রীতিমত পতিতা হয়ে পড়েছে। তার অহেতুক মেক-আপ চর্চিত চেহারা চোখের সামনে

ভেসে উঠতেই মুস্তাকিমের দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো। তার বিবেক তাকে বলতো, মুস্তাকিম, তুমি যা দেখেছ তার জন্যে তুমিই দায়ী। স্ত্রীর কয়েক দিনের অসন্তুষ্টি এবং ক্রোধ সহ্য করতে পারলে মাহমুদার জীবনকে তুমি এ নোংরামী থেকে মুক্ত করতে পারতে। তোমার স্ত্রী বড় জোর রাগ করে বাপের বাড়ী চলে যেতো। তোমার উদ্দেশ্যই সৎ ছিল না। যদি তাই হতো, তুমি যদি সত্যব্রতী হতে, তাহলে একদিন কুলসুম আপনা আপনি ঠিক হয়ে যেতো। তুমি বড় জুলুম করেছ, মারাত্মক পাপ করেছ।

মুস্তাকিম তখন কি আর করতে পারে? কিছুই না। পানি প্রবাহিত হয়ে গেছে। চড়ুই খেতের সব ফসল খেয়ে ফেলেছে। এখন আর কিছু হবার নয়। মৃত্যুপথ যাত্রী রোগীকে অক্সিজেন দিয়ে কি আর লাভ হতে পারে?

কিছুদিন পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বোম্বের পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করলো। দেশ-বিভক্তির পর এখানে সেখানে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এবং লুটপাট চলছিল। বহু লোক হিন্দুস্থান ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যাচ্ছিল। কুলসুম মুস্তাকিমকে বোম্বে ছাড়তে বাধ্য করলো। স্বামী-স্ত্রী করাচী গিয়ে পৌঁছাল। সেখানে মুস্তাকিম একটা ছোটখাট ব্যবসা শুরু করল।

আড়াই বছরে ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি হলা। মুস্তাকিম চাকরী ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি ব্যবসায়ে মনোযোগ দিল।

একদিন বিকেলে মুস্তাকিম সদরে গিয়েছিল একটা পান খাওয়ার জন্যে। কয়েক পা এগোতেই দেখল, একটা পান দোকান, কিন্তু খুব ভীড়। দোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখল, মাহমুদা বসে পান বিক্রি করছে। তার মাংসল চোখে সেই অহেতুক মেক-আপ। চারিপাশের লোকজন তার সাথে নোংরা রসিকতায় মেতে আছে। মাহমুদা হাসছে। মুস্তাকিম স্তব্ধ হয়ে গেল, ভাবছিল দ্রুত কেটে পড়বে। এ সময় তার কানে এল মাহমুদা বলছে, এদিকে এসো দুলা মিয়া। তোমাকে একটা ফার্স্ট কেলাস পান খাওয়াই। তোমার বিয়েতে আমি শরিক ছিলাম।

মুস্তাকিম যেন পাথর হয়ে গেল।

●

আল্লাদতা

দুই ভাই ছিল। আল্লারক্ষা এবং আল্লাদতা। উভয়ে ছিল পাতিয়ালা রাজ্যের অধিবাসী। তাদের পূর্বপুরুষরা অবশ্য লাহোরের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু এ দু'ভাইয়ের পিতামহ চাকুরীর সন্ধানে পাতিয়ালা এসে সেখানে থেকে যান।

আল্লারক্ষা এবং আল্লাদতা উভয়ে ছিল সরকারী কর্মচারী। একজন চীফ সেক্রেটারী বাহাদুরের আর্দালী, অন্যজন কণ্ট্রোলার অব স্টোরস-এর অফিসের চাপরাশি।

খরচ কম পড়বে এ চিন্তায় উভয় ভাই একত্রে থাকতো। বেশ ভালো ভাবেই তাদের দিন কাটছিল। বড়ভাই আল্লারক্ষা ছোট ভাই-এর চালচলন পছন্দ করতো না। আল্লাদতা মদ খেতো, ঘুষ নিতো। মাঝে মধ্যে অসহায় দরিদ্র কোন মহিলাকে ফাঁসিয়ে ফেলত। আল্লারক্ষা সব সময়ে দেখেও না দেখার ভান করেছে যাতে করে ঘরোয়া শান্তি বিপন্ন না হয়।

উভয়ে ছিল বিবাহিত। আল্লারক্ষার দুই মেয়ে। একজনের বিয়ে হয়ে গেছে এবং স্বামীর সংসারে ভালোই দিন কাটছিল। অন্য মেয়ের নাম সোগরা, বয়স তের বছর, সে প্রাইমারী স্কুলে পড়তো।

আল্লাদতার এক মেয়ে, নাম জয়নব। তার বিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু স্বামীর সংসারে সুখ-শান্তি ছিল না। কারণ তার স্বামী খুবই উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের, তবু কোন ক্রমে সে কাটাচ্ছিল। জয়নব ছিল তার ছোট ভাই তোফায়েলের চেয়ে তিন বছরের বড়। এ হিসেবে তোফায়েলের বয়স ছিল আঠার উনিশ বছর। সে লোহার ছোট একটা কারখানায় কাজ শিখছিল। বুদ্ধিমান হওয়ার কারণে শিক্ষানবিশ অবস্থায়ও মাসিক পনের টাকা পেতো।

উভয় ভাই-এর স্ত্রীরা ছিল খুবই আনুগত্যপরায়ণা, পরিশ্রমী এবং পুণ্য-শীলা। স্বামীদের তারা কখনো কোন ব্যাপারে অভিযোগের সুযোগ দেয়নি।

বেশ ভালো ভাবেই দিন কাটছিল। অকস্মাৎ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেঁধে গেল। উভয় ভাই ভাবতেই পারেনি যে, তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর উপর হামলা হবে এবং নিঃস্ব, রিক্ত অবস্থায় তাদেরকে পাতিয়ালা রাজ্য ছাড়তে হবে। কিন্তু তাই হলো।

এ রক্তাক্ত দাঙ্গায় কোন বৃক্ষ উৎপাটিত হয়েছে, কোন বৃক্ষের ডাল ভেঙ্গেছে এটা দু'ভাইয়ের কেউই বলতে পারবে না। সবদিক কিছুটা শান্ত হয়ে এলে বাস্তব বড় কঠিন হয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তারা তখন শিউরে উঠল।

আল্লারক্ষার মেয়ের স্বামীকে দাঙ্গাবাজরা শহীদ করে দিয়েছে এবং তার স্ত্রীকেও নির্মমভাবে জবাই করেছে।

আল্লাদতার স্ত্রীও শিখদের কৃপাণ থেকে রক্ষা পায়নি। তার মেয়ে জয়নবের দুশ্চরিত্র স্বামীকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

কান্নাকাটি করা ছিল নিরর্থক। যারা বেঁচেছিল তারা ধৈর্য ধারণই শ্রেয় মনে করল। প্রথমদিকে ক্যাম্পে পঁচে গলে মরতে লাগল, তারপর অলিগলিতে ভিক্ষে করতে শুরু করল। অবশেষে খোদা ডাক শুনলেন। গুজরানওয়ালার একটি ছোট গৃহে আল্লাদতা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলো, তো ফায়েল এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে একটা কাজ জুটিয়ে নিল।

আল্লারক্ষা দীর্ঘদিন লাহোরে দ্বারে দ্বারে ঘুরে কাটালো। সঙ্গে যুবতী মেয়ে। মনে হয় যেন কেউ মাথায় পাহাড় রেখে দিয়েছে। দেড় বছর সময় বেচারা যে কি করে কাটিয়েছে সেটা খোদাই ভাল জানেন। স্ত্রী এবং বড় মেয়ের চিন্তা এ সময়ে তারা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল। ভয়াবহ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছিল এমন সময় পাতিয়ালা রাজ্যের এক বড় অফিসারের সাথে পরিচয় হলো। আল্লাদতা নিজের দুঃখের কাহিনী তাকে খুলে বলল। লোকটি ছিল দয়ালু। অনেক চেষ্টার পর লাহোরের একটি অস্থায়ী অফিসে সেই অফিসার একটি চাকরী পেলেন। চাকরী পাওয়ার পরদিন থেকে তিনি আল্লারক্ষাকে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে তার অফিসেই একটি চাকরী দিলেন। থাকার জন্যে একটি কোয়ার্টারেরও ব্যবস্থা করলেন।

আল্লারক্ষা খোদার শুকরিয়া আদায় করলো। কারণ তিনি তাকে সব দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এখন সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত মনে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে পারে। সোগরা ছিল খুবই ভাল মেয়ে। সারাদিন সে ঘরের কাজ করতো, এদিক সেদিক থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনতো, পানির কলসী ভরে ঘরে তুলতো, রুটি তৈরী করে তন্দুরে সেঁকতে দিত।

একাকী থাকার সময় মানুষের ভাবনা-চিন্তার ঠিক ঠিকানা থাকে না। নানা ধরনের চিন্তা এসে মাথায় ভিড় করে। সোগরা ঘরে একাকী থাকা কালে মা এবং বোনের স্মৃতি স্মরণ করে অশ্রুজলে প্লাবিত হতো, পিতা ঘরে এলে স্বাভাবিক হয়ে যায়। কারণ সে দুঃখী পিতার মনের ক্ষতের যন্ত্রণা বাড়াতে চায় না। এমনিতেই পিতৃ-হৃদয়ের নীরব যন্ত্রণা সম্পর্কে সে সচেতন। আল্লারক্ষার মন সব সময় কাঁদে, কিন্তু সে তা কার কাছে প্রকাশ করবে? স্ত্রী এবং বড় মেয়ের সম্পর্কে সে সোগরার সাথেও কখনো আলাপ করেনি।

দুঃখ-কষ্টে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। ওদিকে গুজরানওয়ালায় আল্লাদতা তার ভাই আল্লারক্ষার চেয়ে ভালোভাবেই দিন কাটাচ্ছিল। কারণ সেও একটা চাকরীর ব্যবস্থা করেছে। জয়নবও কিছুটা ঘরোয়া কাজ, সেলাই ইত্যাদি করে সংসারে সাহায্য করার চেষ্টা করতো। সব মিলিয়ে মাসে শ'খানেক টাকা উপার্জন হতো যা কিনা তিনজনের জন্যে ছিল যথেষ্ট।

থাকার ঘর বেশী ছিল না, কিন্তু তিনজন তাতেই কোনক্রমে দিন গুজরান করতো। ওপরের তলায় তোফায়েল থাকতো। নীচের তলায় থাকতো জয়নব এবং তার বাবা। উভয়ে পরস্পরের প্রতি যত্ন নিতো। আল্লাদতা জয়নবকে বেশী কাজ করতে দিতো না। খুব ভোরে উঠে ঘরে ঝাড়ু দেয়া, চুলা ধরানো—এসব কাজে সে জয়নবকে সাহায্য করতো। সময় পেলে দু'তিন কলসী পানিও এনে দিতো।

জয়নব তার মৃত স্বামীর কথা কখনো চিন্তা করেনি। এমন ভাব দেখাতো যেন সে তার জীবনে কখনো ছিল না। পিতার সাথে সে সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। মাঝে মাঝে পিতাকে জড়িয়ে ধরতো, তোফায়েলের

সামনেও পিতাকে চুমু খেতো।

সোগরা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের মেয়ে। সম্ভব হলে সে পিতার সঙ্গে পর্দা রক্ষা করতো। এটা অবশ্য অন্য কোন কারণে নয়, পিতার প্রতি অস্বাভাবিক ভক্তি শ্রদ্ধার কারণেই করতো। মাঝে মাঝে তার মন দোয়া করতো, পরওয়ার দেগার, আব্বা যেন আমার জানাজা দেন।

কোন কোন সময়ে কোন কোন দোয়া বিপরীত প্রমাণিত হয়। খোদার যা ইচ্ছা তাই হয়ে থাকে। হতভাগিনী সোগরার মাথায় উপরে বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার অপেক্ষায় ছিল।

জুন মাসের এক মধ্যাহ্নে সোগরার পিতা অফিসের কাজে বাইরে গেল, কিন্তু রাস্তায় লু লেগে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। পথচারীরা হাসপাতালে পৌঁছে দিল। কিন্তু সেখানে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

পিতার মৃত্যুশোকে সোগরা প্রায় পাগল হয়ে গেল। মাথার অর্ধেকের মত চুল ছিঁড়ে ফেলল। প্রতিবেশীরা অনেক করে সান্ত্বনা দিল। কিন্তু সে সান্ত্বনায় কি লাভ! সে ছিল এমন নৌকা, যার কোন চালক নেই। ফলে মাঝ দরিয়ায় ডুবে যাবার উপক্রম।

এমন সময় পাতিয়ালার সেই অফিসার এগিয়ে এলেন। তিনি সর্বাগ্রে সোগরাকে নিজের বাসায় রেখে এলেন এবং স্ত্রীকে তার প্রতি খেয়াল রাখতে বললেন। তারপর হাসপাতালে গিয়ে তিনি আল্লারক্ষার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করলেন।

আল্লাদতা অনেক দেরীতে ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিল। সে লাহোরে গিয়ে খোঁজাখুজির পর ভ্রাতুষ্পুত্রীর কাছে গেল এবং তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিল। বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। পৃথিবীর অস্থায়িত্বের উদাহরণ দিল। কিন্তু সোগরার ভগ্ন হৃদয়ে এসব সান্ত্বনার কিই বা প্রভাব হবে, সে নীরবে অশ্রুপাত করলো।

আল্লাদতা সেই অফিসারকে বললেন, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনি যা করেছেন তা আমি ভুলতে পারব না। মরহুমের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেছেন, নিরাশ্রয়া অনাথিনীকে ঘরে এনে জায়গা দিয়েছেন। খোদা আপনাকে সে জন্য পুরস্কৃত করবেন। আমি এবার

ওকে সঙ্গে নিয়ে যাই। ও আমার মরহুম ভাইয়ের মূল্যবান নিদর্শন।

অফিসার সাহেব বললেন, ঠিক আছে, কিন্তু ওকে আরো কিছুদিন এখানে থাকতে দাও। ও আরো কিছুটা স্বাভাবিক হলে ওকে নিয়ে যেয়ো।

আল্লাদতা বলল, হুজুর, আমি ইচ্ছে করেছি, ওকে শীগগিরই আমার ছেলের সাথে বিয়ে দেব।

অফিসার খুশী হলেন। বললেন, বড় ভাল চিন্তা। কিন্তু বিয়ে দেয়ার ইচ্ছে যখন করেছ ওকে এখনি নিয়ে যাওয়া সমীচীন হবে না। তুমি গিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করো। আমাকে বিয়ের তারিখ জানাবে। খোদার ফজলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আল্লাদতা গুজরানওয়ালা চলে গেল। তার অনুপস্থিতিতে জয়নব খুবই উদাস হয়ে পড়েছিল। বাড়ী ফিরলে সে পিতাকে জড়িয়ে ধরে এতো দেরী হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল।

আল্লাদতা সোহাগ ভরে তাকে একদিকে সরিয়ে দিয়ে বলল, আরে বাবা, যাওয়া-আসা, কবরে ফাতেহা পড়া, সোগরার সাথে দেখা করা, ওকে এখানে নিয়ে আসা কম ঝক্কি তো নয়।

জয়নব কি যেন ভেবে বলল, সোগরাকে এখানে নিয়ে আসা মানে? সোগরা তাহলে কোথায় আছে?

আল্লাদতা বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল, ওখানে আছে, পাতিওয়ালার পুণ্যপ্রাণ একজন অফিসারের বাসায়। তিনি বলেছেন, ওর বিয়ের ব্যবস্থা করার পর নিয়ে যেয়ো।

জয়নব আগ্রহে বলল, ওর বিয়ের ব্যবস্থা করছে বুঝি? জানাশোনা কোন ছেলে আছে তোমার হাতে?

আল্লাদতা কেশে বলল, আরে ভাই, আমার তোফায়েল বড় ভাইয়ের একটাই নিদর্শন,—আমি ওকে অন্যের হাতে দেব কেন!

জয়নব শীতল গলায় বলল, তাহলে সোগরাকে তুমি তোফায়েলের সাথে বিয়ে দেবে?

আল্লাদতা বলল, হ্যাঁ। কেন তোমার কোন আপত্তি আছে নাকি?

জয়নব দৃঢ়স্বরে বলল, হ্যাঁ, আর কেন তা তোমার অজানা নয়। এ বিয়ে

কিছুতেই হবে না।

আল্লাদতা হাসলো, জয়নবের চিবুক ধরে তাকে চুমু খেয়ে বলল, পাগলি, সব ব্যাপারেই সন্দেহ করবে। অন্য কথা রাখো, যতো কিছু হোক, আমি তোমার বাপ।

জয়নব বিরক্তির সাথে বলল, হুঁ? বাপ! এই বলে সে ভেতরের কামরায় গিয়ে কাঁদতে লাগল।

আল্লাদতা জয়নবকে অনুসরণ করলো এবং তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

দিন কাটতে লাগল। তোফায়েল ছিল অনুগত ছেলে। তার পিতা সোগরার সাথে তার বিয়ে দিতে চাইলে সে কোন আপত্তি করল না। মেনে নিল।

তিন চার মাস পর বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা হলো। অফিসার সাহেব সোগরাকে বিয়ের দিন পরিধানের জন্য এক সেট পোষাক এবং একটি আংটি তৈরী করে দিলেন। তারপর অসহায় অনাথ মেয়েটিকে সাধ্যমত সাহায্য করার জন্য মহল্লার লোকদের প্রতি আবেদন জানালেন।

এলাকার প্রায় সবাই সোগরার অবস্থার কথা জানতো, এজন্য তারা সাধ্যমাফিক সাহায্য করে সোগরাকে বেশ ভাল যৌতুকের ব্যবস্থা করে দিল।

বিয়ের কনে সেজে বসার পর সব দুঃখ এসে সোগরাকে ঘিরে ধরল। যাই হোক, সে শ্বশুরালয়ে পৌঁছালো, কিন্তু জয়নব তাকে এমনভাবে গ্রহণ করলো যে, সোগরা বুঝতে পারলো, বোনের ব্যবহারের পরিবর্তে তাকে শাশুড়ীর মত ব্যবহারই পেতে হবে।

সোগরার আশংকা সত্য হলো। হাতের মেহেদী মুছতে না মুছতেই সে চাকরাণীর মত কাজ করতে বাধ্য হলো। ঘর ঝাড়ু দেয়া, প্লেট ধোয়া, চুলা ধরানো, পানি আনা ইত্যাদি সাংসারিক সব কাজই তাকে প্রায় একা করতে হতো। সোগরা চমৎকারভাবে গুছিয়ে সব কাজ করতো। তবু জয়নবকে খুশী করতে পারত না। জয়নব কথায় কথায় তাকে ধমকাতো, শাসন করতো।

সোগরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো যে, সে সবকিছু সহ্য করবে, কখনো অভিযোগের একটি শব্দও উচ্চারণ করবে না। কারণ এ আশ্রয় হারালে তার

আর কোন ঠিকানা থাকবে না।

আল্লাদতা অবশ্য তার সাথে খারাপ ব্যবহার করত না। জয়নবের দৃষ্টির আড়ালে সে সোগরাকে আদর করতো এবং কোন চিন্তা না করার উপদেশ দিতো। বলতো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সোগরা এতে মনোবল এবং সান্ত্বনা পেতো। জয়নব তার কোন বান্ধবীর সাথে দেখা করতে গেলে আল্লাদতা সোগরাকে মন খুলে আদর সোহাগ জানাতো। তার সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতো। কাজে কর্মে তাকে সাহায্য করতো। তার জন্যে লুকিয়ে রাখা এটা ওটা তাকে খেতে দিতো। বুকে জড়িয়ে ধরে বলতো, তুমি বড় ভাল মেয়ে।

সোগরা সংকোচে ম্রিয়মান হয়ে যেতো। আসলে সে এতো উগ্র সোহাগের সাথে পরিচিত ছিল না। তার মরহুম পিতা তাকে আদর করতে চাইলে বড় জোর তার মাথায় হাত রেখে, বা কাঁধে হাত রেখে বলতো, মা, আল্লা তোর নসিব ভালো করুন।

তোকায়েলের সাথে সোগরার দিন ভালোই কাটছিল। তোকায়েল বেশ ভাল স্বামী। যা উপার্জন করতো সব সোগরার হাতে তুলে দিত, সোগরা জয়নবের ভয়ে সব তাকে দিয়ে দিত।

জয়নবের দুর্ব্যবহার এবং শাশুড়ীর মত আচরণ সম্পর্কে সোগরা তোকায়েলের কাছে কখনো অভিযোগ করেনি। সে ছিল শান্তিপ্রিয়। তার কারণে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হোক এটা সে কিছুতেই চাইতো না। আরো কিছু কথা ছিল যা তোকায়েলকে বললে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে যেতো, কিন্তু সোগরার আশংকা ছিল যে, এতে অন্যরা রেহাই পাবে, শুধু সেই ফেঁসে যাবে এবং সে ঝড়ের তাণ্ডব সইতে পারবে না।

কিছুদিন থেকে সেসব বিশেষ ব্যাপার সে জেনে ফেলেছিল। তারপর থেকে আল্লাদতা আদর করতে চাইলে সে এক পাশে সরে যেতো অথবা আতঙ্কিত হয়ে উপরে নিজেদের শোবার ঘরে চলে যেতো।

তোকায়েলের ছুটি ছিল শুক্রবারে, আল্লাদতার রোববারে। জয়নব ঘরে থাকলে তাড়াতাড়ি কাজ করে সোগরা উপরে চলে যেতো। কোন

রোববারে ঘটনাক্রমে জয়নব যদি বাইরে যেতো সোগরার দেহে যেন প্রাণ থাকত না। কোন কাজে হাত দিতে ইচ্ছে হতো না, কিন্তু জয়নবের ক্রোধের ভয়ে কম্পিত হাতে সব কাজ করতো। তাছাড়া সময়মত খাবার তৈরী না করলে তার স্বামীকেও না খেয়ে থাকতে হবে, ঠিক বারোটায় তোফায়েল খাবার নেয়ার জন্যে একটা ছেলেকে পাঠিয়ে দেয়।

এক রোববারে জয়নব ঘরে ছিল না, সোগরা রুটি তৈরীর জন্য রান্নাঘরে আটা মাখছিল। আল্লাদতা চাপা পায়ে পেছন থেকে এসে সোগরার চোখ টিপে ধরল। সোগরা ছটফট করলো, কিন্তু আল্লাদতা তাকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরলো।

সোগরা চীৎকার জুড়ে দিল, কিন্তু সেখানে শোনার মত কেউ ছিল না। আল্লাদতা বলল, সোরগোল করে কোন লাভ হবে না, চলে এসো।

আল্লাদতা তাকে বিছানায় নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। হালকা পাতলা সোগরার দেহে অসামান্য শক্তির সঞ্চার হলো এবং সে নিজেকে আল্লাদতার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে ছুটে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিল।

কিছুক্ষণ পর জয়নব এলো। আল্লাদতার মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভেতরের কামরায় শুয়ে সে জয়নবকে ডাকলো। জয়নব গেলে বলল, এদিকে এসো, পা টিপে দাও। জয়নব উচ্ছল ভঙ্গিতে চৌকির ওপরে বসে পিতার পা টিপতে লাগল। অল্পক্ষণ পরে উভয়ের নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে এলো।

জয়নব আল্লাদতাকে বলল, কি ব্যাপার, আজ তুমি নিজের মধ্যে নেই মনে হচ্ছে।

আল্লাদতা ভাবলো, জয়নবের কাছে লুকানো নিরর্থক। সে সব কথা জয়নবকে খুলে বলল। জয়নব রেগে আগুন হয়ে গেলো। বলল, একটা কি তোমার জন্যে যথেষ্ট ছিল না? প্রথমে তোমার লজ্জা হয়নি, কিন্তু এখন তো হওয়া উচিত। আমি আগেই জানতাম যে এরকম হবে, এজন্যে আমি এ বিয়ের বিরোধিতা করেছিলাম। এখন শোনো, সোগরা

এ ঘরে থাকতে পারবে না।

আল্লাদতা করুণ স্বরে বলল, কেন ?

জয়নব খোলাখুলি বলে দিল, এ ঘরে আমি নিজের সতীন দেখতে চাই না।

আল্লাদতার কণ্ঠ শুকিয়ে গেল, সে কোন কথা বলতে পারল না।

জয়নব বাইরে বেরিয়ে দেখল, সোগরা উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছে। সে ভাবলো, সোগরাকে কিছু বলবে, কি যেন ভেবে কিছু বলল না।

এ ঘটনার পর দু'মাস কেটে গেল। সোগরা অনুভব করলো যে, তোফায়েল তার কাছে কিছু যেন লুকাচ্ছে এবং কথায় কথায় তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। অবশেষে একদিন তোফায়েল সোগরার হাতে তালাকনামা দিয়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দিল।

●

বিয়ে

জামিলকে নিজের 'শোফার লাইফ টাইম' কলম মেরামত করতে দিতে হবে। এ জন্য টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে শোফার কোম্পানীর নাম্বার খুঁজে বের করল। ফোন করে জানা গেল যে, মিসেস ডি. জে. শিমুয়ের কোম্পানী এজেন্ট, গ্রীন হোটেলের কাছে তার অফিস।

জামিল ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে গিয়ে পৌঁছাল। গ্রীন হোটেলে পৌঁছে মিসেস ডি জে. শিমুয়েরের অফিস খুঁজে পেতে অসুবিধা হলো না। হোটেলের কাছেই একটি ভবনের তিনতলায় অফিস।

জামিল লিফটের সাহায্যে সেখানে পৌঁছাল। কক্ষে প্রবেশ করে দেখলো জানালার ওপাশে সুদর্শনা এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে বসে আছে। মেয়েটির বক্ষ অস্বাভাবিক রকমের স্ফীত। জানালা দিয়ে জামিল কলম বাড়িয়ে দিল, মুখে কিছু বলল না। মেয়েটি তার হাত থেকে কলম নিয়ে খুলে দেখল, তারপর একটি ছোট কাগজে কিছু লিখে কিছু না বলেই জামিলের হাতে দিল।

জামিল হাতে নিয়ে দেখল কলমের রশিদ। চলেই যাচ্ছিল, এমন সময় পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলো, মনে হয় দশ-বারো দিনে মেরামত হয়ে যাবে। তাই না?

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠলো। জামিল ড্যাব ড্যাব চোখে তাকিয়ে বলল, আমি আপনার এ হাসির অর্থ বুঝতে পারলাম না।

জানালার সাথে মুখ লাগিয়ে মেয়েটি বলল, মিষ্টার, আজকাল যুদ্ধ চলছে —এ কলম আমেরিকা যাবে। ন'মাস পর এসে খোঁজ করবেন।

ন'মাস? জামিলের কণ্ঠে বিস্ময়। মেয়েটি ধূসর রঙের চুল ঝাঁকিয়ে হাঁ সূচক মাথা নাড়ল। জামিল লিফট-এর দিকে এগিয়ে গেল।

এই ন'মাস বড় খারাপ। ন'মাস! এই ন'মাসে তো একজন মেয়ে একটি সন্তান গর্ভে ধারণ করে প্রসব করতে পারে। ন'মাস! ন' মাস এ ছোট স্লিপটা যত্ন করে রাখা, ন'মাস পর কি মনে থাকবে যে,

আমি একটা কলম মেরামত করতে দিয়েছি? এ সময়ে সে হতভাগার মরে যাওয়াও তো বিচিত্র নয়।

জামিল ভাবলো, সব একটা ঢং ছাড়া কিছু নয়। কলম সামান্য নষ্ট হয়েছিল, ফিডারে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী কালি বেরোয়, এজন্য একটি কলমকে আমেরিকার হাসপাতালে পাঠানো নিঃসন্দেহে একটা চালবাজি। আবার ভাবলো, অভিশাপ দিই কলমের উপর। এটা আমেরিকা যাক বা আফ্রিকা যাক, তাতে আমার কি! এটা যে চোরা বাজারে একশত পঁচাত্তর টাকায় কিনেছিলাম, এক বছর ব্যবহার করেছি, হাজার হাজার পৃষ্ঠা সাদা কাগজ কালো করেছি। এ-ই যথেষ্ট।

এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ফোর্টের মদের দোকানের কথা তার মনে পড়লো। হুইস্কি পাওয়া যাবে না সে জানতো, কিন্তু ফ্রান্সের কোক-এর ব্রাণ্ডি তো অবশ্যই পাওয়া যাবে। জামিল এসব ভেবে নিকটের একটা মদের দোকানে প্রবেশ করলো।

ব্রাণ্ডির একটা বোতল ক্রয় করে ফিরছিল। গ্রীন হোটেলের কাছে এসে থেমে গেল। হোটেলের নীচে দেহ-সাইজ আয়নার শো-রুম। দোকানের মালিক জামিলের বন্ধু পীর সাহেব।

জামিল ভাবলো ভেতরে প্রবেশ করবে। শো-রুমে প্রবেশ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চেয়ে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুর সাথে সে হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠলো।

ব্রাণ্ডির বোতল হালকা কাগজে জড়িয়ে এক পাশে রেখে দিয়েছে। সে-দিকে ইঙ্গিত করে পীর সাহেব বলল, ইয়ার, এ দুলহিনের ঘোমটা খোল। ওর সাথে একটু রঙ্গরস করা যাবে।

জামিল বুঝে ফেলল। বলল, তাহলে পীর সাহেব, গ্লাস আর সোডার ব্যবস্থা করো, তারপর দেখবে রঙ্গরস কেমন জমে।

অল্পক্ষণের মধ্যে সোডা এবং গ্লাস হাজির করা হলো। প্রথম পালা চললো, দ্বিতীয় পালা শুরু করতে যাবে এমন সময় পীর সাহেবের গুজরাটী বন্ধু ভেতরে প্রবেশ করে অসংকোচে এক পাশে বসে গেল। হোটেলের বেয়ারা তিনটা গ্লাস এনেছিল, পীর সাহেবের গুজরাটী বন্ধু উর্দু ভাষায় কিছু-

ক্ষণ এদিক সেদিকের কথা বলে এক পেগ ঢেলে সোডা মিশালো। তারপর তিন-চার বারে গলায় সবটুকু ঢেলে বললো, সিগারেট বের কর।

পীর সাহেবের মধ্যে অনেক দোষ আছে ঠিকই তবে সে সিগারেট খায় না। জামিল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটার বের করে টেবিলের উপর রাখলো।

পীর সাহেব জামিলের সাথে তার বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, মিষ্টার নেটুর লাল, মণি-মুক্তার দালালী করে।

জামিলের দিকে তাকিয়ে নেটুরকে বলল, মিষ্টার জামিল, বড় লেখক।

উভয়ে করমর্দন করলো এবং ব্রাণ্ডির নতুন পালা শুরু হল। এক সময়ে বোতল খালি হয়ে গেল।

জামিল ভাবলো এই মুক্তার দালাল মদ পানে তো ওস্তাদ দেখছি! আধার সাধের ব্রাণ্ডির পুরো বোতলটাই খালি করে ফেলেছে। শেষ পেগ পেটে পড়ার পর জামিল নেটুরকে মাফ করে দিয়ে বলল, মিষ্টার নেটুর, চলুন, আর এক বোতল হয়ে যাক।

নেটুর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। ধুতির পাড় ঠিক করে বলল, চলুন।

জামিল পীর সাহেবকে বলল, আমরা এক্ষুণি আসছি।

জামিল এবং নেটুর বাইরে এসে ট্যাক্সি নিয়ে একটা মদের দোকানের সামনে পৌঁছলে জামিল ট্যাক্সি থামালো। নেটুর বলল, মিষ্টার জামিল, এ দোকান যথার্থ নয়, সব জিনিষ বেশী দামে বিক্রি করে। এই বলে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, কোলাবা চলো।

কোলাবা পৌঁছে নেটুর জামিলকে মদের একটি ছোট দোকানে নিয়ে গেল। জামিল ফোর্ট থেকে যে ব্রাণ্ডি নিয়েছিল সেটা এখানে পেল না, অন্য একটা পেল। নেটুর সে মদের প্রশংসা করে বলল, এক নম্বর জিনিস।

এই এক নম্বর জিনিস ক্রয় করে উভয়ে বেরোল। সঙ্গেই ছিল একটা বার। নেটুর বলল, কি বলেন মিষ্টার জামিল, দু-এক পেগ এখানেই চলুক।

জামিল কোন আপত্তি করল না।

তার নেশার ঘোর কাটেনি। উভয়ে বারে প্রবেশ করলো। জামিলের মনে হলো, বারের মালিক কিছুতেই বাইরের মদ তার বারে বসে খেতে

দেবে না। এই ভেবে মিষ্টার নেটুরকে বলল, এখানে খাবেন কি করে? ওরা তো অনুমতি দেবে না।

নেটুর চোখের ইশারা করে বলল, সব কিছু চলে। এ কথা বলে সে একটা কেবিনে প্রবেশ করলো। জামিল তাকে অনুসরণ করলো।

নেটুর টেবিলের উপর বোতল রেখে বেয়ারাকে ডেকে পাঠালো। বেয়ারা এলে তাকে চোখ ঠেরে বলল, দেখো, দুটো সোডা রোজার্স, ঠাণ্ডা—এবং দুটো গ্লাস—একদম পরিষ্কার।

আদেশ শুনে বেয়ারা চলে গেল এবং সোডা, গ্লাস হাজির করল। নেটুর বেয়ারাকে বলল, ফার্স্টক্লাশ চিপস্, টমেটো জুস এবং ফার্স্টক্লাশ কাটলেট।

বেয়ারা চলে গেল। জামিলের প্রতি তাকিয়ে নেটুর হাসলো। বোতলের মুখ খুলে জামিলকে জিজ্ঞেস না করে তার গ্লাসে মদ ঢেলে দিল, নিজের গ্লাসও ভর্তি করে নিল, তারপর সোডা মিশালো। সোডা গলে গেলে উভয়ে গ্লাস ঠোকাঠুকি করলো।

জামিলের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। সে এক নিঃশ্বাসে অর্ধ গ্লাস খেয়ে ফেলল। সোডা খুব ঠাণ্ডা এবং ঝাঁঝালো হওয়ায় ফুঁফুঁ করতে লাগলো।

দশ-পনের মিনিটের মধ্যে চিপস্ এবং কাটলেট এসে গেল। জামিল সকালে ঘর থেকে নাশতা খেয়ে বেরিয়েছিল। ব্রাণ্ডি খেয়ে তার ক্ষুধা পেল। চিপস্ কাটলেট দুটোই গরম ছিল। উভয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দু'মিনিটে সমস্ত খাবার সাবাড় করে ফেলল।

আরো দু'প্লেট আনানো হল। জামিল নিজের জন্য চিপস্ চেয়ে নিল। এ ভাবে দু'ঘন্টা কেটে গেল। বোতলের তিন-চতুর্থাংশ গায়েব হলো। জামিল ভাবলো, এখন পীর সাহেবের কাছে যাওয়া অর্থহীন।

নেশা জমে উঠেছে। উভয়ে আনন্দে ডগমগ করছিল। নেটুর এবং জামিল উভয়ে হাওয়াই ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছে। এ ধরনের সওয়ারীদের সাধারণতঃ এমন জনপদে যেতে ইচ্ছে করে যেখানে নগ্নদেহ সুন্দরীদের দেখা পাওয়া যায়। সুন্দরীদের কোমরে হাত দিয়ে তারা সেই ঘোড়ায় আরোহণ করে ভেসে বেড়াতে চায়।

জামিলের মন-মগজ তখন সুন্দরী নারীদেহের সাথে একাত্ম হয়ে

যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর। সে জানতো যে, ব্রথেল-এর কারণে সারা বোম্বেতে বিখ্যাত জায়গায় সে এখন দাঁড়িয়ে আছে। আরামপ্রিয়রা এখানেই ছুটে আসে। শহরের যেসব মেয়ে লুকিয়ে ছাপিয়ে ব্যবসা করে তারা এখানে চলে আসে। এসব জানা থাকায় জামিল নেটুরকে বলল, আমি বলছিলাম কি এখানে মানে এদিকে কোন ছুকরি-টুকরি পাওয়া যায় না?

নেটুর গ্লাসে মদ ভর্তি করে হেসে বলল, মিষ্টার জামিল, এক নয়, হাজারো—, হাজারো—, হাজারো—।

এই হাজারোর নামতা কতক্ষণ চলতো কে জানে! জামিল বলল, এই হাজারোর মধ্যে আজ যদি একটি পাওয়া যায় তাহলে বুঝবো যে, নেটুর ভাই অসাধ্য সাধন করেছে।

নেটুর মউজে ছিল। বলল, জামিল ভাই, এক নয়, হাজারো। চলো তুমি। এগুলো আগে শেষ করে নাও।

বোতলে যেটুকু তখনো বাকি ছিল উভয়ে আধঘণ্টার মধ্যে শেষ করল। তারপর বিল পরিশোধ করে এবং বেয়ারাকে টিপস্ দিয়ে বাইরে বেরোল। ভেতরে অন্ধকার থাকায় বাইরে বেরোবার সাথে সাথে জামিলের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। খানিক্ষণ সে কিছুই দেখতে পেল না। আস্তে আস্তে তার চোখ তীব্র আলোর ধাঁধা কাটিয়ে স্বাভাবিক হলে সে নেটুরকে বলল, চলো।

নেটুর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে জামিলের প্রতি তাকিয়ে বলল, মালপানি আছে না?

জামিল নেশাতুর হাসি হেসে নেটুরকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, অনেক—নেটুর ভাই অনেক। একশ টাকার পাঁচটা নোট দেখিয়ে বলল, এই কি যথেষ্ট নয়?

নেটুর অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, যথেষ্ট। অনেক বেশী। এসো যাই। এসো একটা বোতল ক্রয় করি, ওখানে প্রয়োজন হবে।

জামিল ভাবলো ঠিক কথা। ওখানে প্রয়োজন না হলে আর কোথায় প্রয়োজন হবে? সঙ্গে সঙ্গে সে একটা বোতল ক্রয় করলো। ট্যাক্সি তখনো দাঁড়িয়ে। উভয়ে উঠে বসলো। এবং ইপ্সিত স্থানে ভ্রমণের

উদ্দেশ্যে চলল।

অসংখ্য ব্রথেল, বিশ পঁচিশটি ঘর খুঁজে দেখা হলো। কোন মেয়েই জামিলের পছন্দ হলো না। সবাই মেক-আপের মোটা আবরণের নীচে লুকিয়ে আছে। জামিল এমন একটা মেয়ে চাচ্ছিল যাকে দেখে মেরামত গৃহের কথা মনে না পড়ে। যাকে দেখে যেন মনে না হয় যে, পলেস্তারা খসে পড়া অট্টালিকায় আনাড়ি হাতে চুন সুরকি লাগানো হয়েছে।

নেটুর অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। তার সামনে কোন মেয়ে এলে তার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বলতো, জামিল ভাই, চলবে?

জামিল উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলতো, চলবে এবং আমরাও চলবো।

আরো দু'জায়গায় দেখা হলো, কিন্তু জামিল হতাশ হলো। সে ভাবলো এসব মেয়েদের কাছে কারা আসে, যাদের দেখে শূকরের শুকনো মাংসের মতো মনে হয়। ওদের ভাবভঙ্গি কত অশ্লীল। ওঠা বসার ধরন কি রকম নোংরা। এমনিতে বলা হয় 'প্রাইভেট' অর্থাৎ এমন মেয়ে যারা লুকিয়ে, পর্দার আড়ালে পেশা করে। জামিল বুঝতে পারে না সেই পর্দা কোথায় যে পর্দার আড়ালে ওরা ধান্দা করে বেড়ায়।

জামিল ভাবছিল এবার কি করবে। এমন সময় নেটুর ট্যাক্সি থামিয়ে নামতে নামতে বলল, হঠাৎ একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের কথা মনে পড়ে গেল। এই বলে সে চলে গেল।

জামিল তখন একাকী। ট্যাক্সি ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতিতে ছুটে চলেছে। তখন বিকেল সাড়ে চারটা। জামিল ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, এখানে কোন ভাড়ুয়া পাওয়া যাবে?

ড্রাইভার জবাবে বলল, হ্যাঁ, পাওয়া যাবে।

জামিল বলল, চলো তাহলে। ড্রাইভার দু'তিনটি মোড় ঘুরে একটি পাহাড়ী বাংলো মত বিল্ডিং-এর সামনে গাড়ী থামিয়ে দু'তিনবার হর্ন বাজালো।

নেশার ঘোরে জামিল তখন ঢুলু ঢুলু। কখন কি হয়েছে সে বলতে পারবে না। নেশার ঘোর কেটে যেতে দেখল একটি পালঙ্কে সে বসে আছে। পাশে একটি যুবতী মেয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

জামিল মেয়েটির প্রতি ভালো করে তাকালো। প্রথমে জামিল ভাবলো সে এখানে এলো কি ভাবে। পরে ভাবলো, ওসব ভেবে কি হবে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভেতরে গুণে দেখল টাকা ঠিকই আছে, সামনের ছোট টেবিলে ব্রাণ্ডির বোতল রয়েছে। তার নেশা অনেকটা কেটে গিয়েছিল। মেয়েটির কাছে উঠে গিয়ে সে বলল, বল, মন-মেজাজ কেমন?

মেয়েটি চিরুণি নামিয়ে রেখে বলল, বলুন, আপনি কেমন?

ভাল আছি। বলেই মেয়েটির কোঁমরে হাত রেখে বলল, আপনার নাম?

একবার তো বলেছি। আপনি ট্যাক্সি করে এখানে এসেছেন, কোথায় কোথায় ঘুরেছেন, ট্যাক্সির ভাড়া আটত্রিশ টাকা হয়েছিল সে ভাড়া মিটিয়েছেন, নেটুর নামে একটা লোককে প্রচুর গালি দিয়েছেন। সম্ভবত এসব কিছুই মনে নেই আপনার।

জামিল সবকিছু মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে ভাবলো, তার আর দরকার কি!

আমি সবকিছু ভুলে যাই। বার বার জিজ্ঞেস করে আনন্দ পাই। তবে হ্যাঁ এটা মনে আছে যে, আটত্রিশ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া পরিশোধ করেছি।

মেয়েটি পালঙ্কের উপর বসে বলল, আমার নাম তারা।

জামিল তাকে বিছানায় শুইয়ে কিছুক্ষণ আদর করে বলল, সোডা এবং গ্লাস দরকার।

তারা অল্পক্ষণের মধ্যেই এ দু'টো জিনিস হাজির করলো। জামিল বোতল খুলল। নিজের জন্য এক পেগ এবং তারার জন্য আরেক পেগ তৈরী করলো। তারপর উভয়ে পান করতে শুরু করলো।

তিন পেগ পান করার পর জামিল অনুভব করলো যে, তার অবস্থা ভাল হয়ে গেছে। তারাকে চুমু খেয়ে চেটে সে ভাবলো এবার ঘটনা সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। সে তারাকে বলল, কাপড় খোলো।

সব?

হ্যাঁ, সব।

তারা কাপড় খুলে শুয়ে পড়ল। জামিল তারার নগ্ন দেহের প্রতি তাকিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, ভালোই। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি

চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খেলো। জামিল বিবাহিত। স্ত্রীকে সে দু'তিনবার দেখেছে। সে ভাবলো, আমার স্ত্রীর দেহ কেমন হবে? সে কি তারার মত একবার বলতেই সব কাপড় খুলে শুয়ে পড়বে? সে কি তার সাথে ব্রাণ্ডি খাবে? তার চুল কি ছোট করে কাটা থাকবে?

হঠাৎ জামিলের বিবেক বোধ জেগে উঠে তাকে জ্বালাতন করতে শুরু করল। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সে সেরে ফেলেছে। শুধু এখন শ্বশুরালয়ে গিয়ে বৌ-এর হাত ধরে নিয়ে এলেই হলো। তার কি উচিত একটি বাজারের মেয়েকে বুকে জড়িয়ে আদর করা, তার রূপ সৌন্দর্য উপভোগ করা।

জামিল খুবই ক্লান্ত এবং অবসন্ন বোধ করল। ধীরে ধীরে তার চোখ বুঁজে এলো এবং সে ঘুমিয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যে তারাও ঘুমিয়ে গেল।

জামিল কয়েকবার সামঞ্জস্যহীন উদ্ভট স্বপ্ন দেখল। ঘন্টা দুয়েক পর একটা ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে সে ধড়ফড় করে উঠে বসলো। চোখ কচলে চারদিকে চেয়ে দেখল সে একটা অপরিচিত কামরায় রয়েছে, তার পাশে একটি নগ্ন মেয়ে শুয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর সবকিছু তার কাছে স্পষ্ট হতে লাগল।

সে নিজেও ছিল নগ্ন। সে ভীতবিহ্বল হয়ে তাড়াতাড়ি করে উল্টো পায়জামা পরলো, কিন্তু সেদিকে তার কোন খেয়াল নেই। জামা গায়ে দিয়ে সে পকেট হাতড়ালো। টাকা সবই রয়েছে। সোডা ঢেলে এক পেগ মদ পান করলো, তারপর তারাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, ওঠো।

তারা চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসলো। জামিল বলল, কাপড় পরে নাও।

তারা বস্ত্র পরিধান করলো। বাইরে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। জামিল ভাবলো, এবার চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু সে তারাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিল। কারণ তার মনে প্রশ্ন জেগেছে। তারাকে জিজ্ঞেস করল, বল তো তারা, আমি তোমাকে কাপড় খুলতে বলার পর তুমি বিবস্ত্র হয়ে শুয়ে পড়লে। তারপর কি হলো?

তারা জবাব দিল, কিছুই না, আপনি বস্ত্র ত্যাগ করলেন এবং আমার

বাহুতে হাত বুলাতে বুলাতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ব্যস ?

হাঁ, কিন্তু ঘুমোবার আগে. আপনি অস্ফুট স্বরে দু'তিন বার বলেছেন, আমি গুনাহগার, আমি গুনাহগার।

কথা শেষ করে তারা উঠলো এবং নিজের চুল আঁচড়াতে লাগল।

জামিল পাপ-অনুভূতি দূর করার জন্য তাড়াতাড়ি ডবল পেগ পান করল। তারপর কাগজে বোতল জড়িয়ে দরজার দিকে গেল।

তারা জিজ্ঞেস করল, চললেন ?

হাঁ, আবার কখনো আসব। এই বলে জামিল সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে বড় বাজারের দিকে পা বাড়াতেই হর্ন বেজে উঠলো। পেছন ফিরে জামিল দেখল একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলো, যাক, ভালই হয়েছে, এখানেই যখন পেলাম পায়ে হাঁটার ধকল সইতে হবে না। জামিল ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, কেন ভাই. খালি নাকি ?

ড্রাইভার বলল, খালি আছে মানে ? অপেক্ষায় আছে।

তা হলে ? এ কথা বলে জামিল পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলো।

কোথায় যাচ্ছ শেঠ ?

জামিল জবাব দিল, অন্য কোন ট্যাক্সি দেখছি।

ড্রাইভার বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো ? এ ট্যাক্সি তো তুমিই রেখেছ ?

জামিল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, আমি ?

ড্রাইভার রাগতস্বরে বলল, হাঁ, তুমি। শালা দারু খেয়ে সবকিছু ভুলে গেছে।

এরপর তুই তোকারি শুরু হলো। এদিক সেদিক থেকে লোক এসে জড় হলো।

জামিল ট্যাক্সির দরজা খুলে ভেতরে বসে বলল, চলো। ড্রাইভার হর্ন দিতে দিতে বলল, কোথায় ?

জামিল বলল, পুলিশ স্টেশন।

এর ফলে ড্রাইভার কি সব আজেবাজে বকবক করলো। জামিল চিন্তায় পড়ে গেল। সে যে ট্যাক্সি নিয়েছিল সে ট্যাক্সির ভাড়া তো আটত্রিশ টাকা আদায় করে নিয়েছে। এখন এ নতুন ট্যাক্সি এলো কোথা থেকে? যদিও সে নেশায় চুর ছিল তবু নিশ্চিত বলতে পারে যে, আগের ট্যাক্সি আর এ ট্যাক্সি এক নয়। আর এ ড্রাইভারও সেই ড্রাইভার নয়, যে তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল।

ট্যাক্সি পুলিশ স্টেশনে পৌঁছাল। জামিলের পা অতিরিক্ত কাঁপছিল। ডিউটি রত সাব-ইন্সপেক্টর ব্যাপারটা আঁচ করে জামিলকে একটা চেয়ারে বসতে বললেন।

ড্রাইভার তার কাহিনী বলতে শুরু করলো। যা কি না ছিল সম্পূর্ণ সাজানো এবং বানোয়াট। জামিল নিঃসন্দেহে প্রতিবাদ করতো, কিন্তু তার বেশী কথা বলার শক্তি ছিল না। সাব ইন্সপেক্টরকে সম্বোধন করে বলল, জনাব, আমি এর কিছু মাথা মুণ্ডু বুঝতে পারছি না। যে ট্যাক্সি আমি নিয়েছিলাম তার ভাড়া আটত্রিশ টাকা পরিশোধ করেছি। এখন এ ট্যাক্সিওয়ালা কোত্থেকে এসে কিসের ভাড়া চাচ্ছে বুঝতে পারছি না।

ড্রাইভার বলল, হুজুর, ইন্সপেক্টর বাহাদুর, ও দারু পান করেছে। প্রমাণ হিসেবে সে জামিলের ব্রাণ্ডির বোতল টেবিলের উপর রাখল।

জামিল ক্রুদ্ধস্বরে বলল, আরে ভাই, কোন শুয়র বলেছে, আমি পান করিনি? কিন্তু প্রশ্ন হলো, আপনি এসেছেন কোথা থেকে?

সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন ভাল লোক। ড্রাইভারের হিসেবে ভাড়া হয় বিয়াল্লিশ টাকা। তিনি পনের টাকায় ফয়সালা করে দিলেন। ড্রাইভার অনেক হৈ চৈ করলো, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। সাব-ইন্সপেক্টর তাকে ধমক দিয়ে থানা থেকে বের করে দিলেন। তারপর একজন পুলিশকে বললেন, জামিলকে সঙ্গে নিয়ে যেন একটা ট্যাক্সিতে তুলে বাড়ীতে দিয়ে আসে। জামিল জড়ানো স্বরে সাব-ইন্সপেক্টরকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বলল, জনাব, এটা কি গ্রাণ্ট রোড পুলিশ ফাঁড়ি?

সাব-ইন্সপেক্টর অট্টহাসি হেসে জামিলের পেটে হাত দিয়ে বললেন, মিষ্টার, এবার প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তুমি খুব টেনেছ। এটা হলো কোলাবা

পুলিশ ফাঁড়ি। যাও, এবার বাড়ী গিয়ে ঘুমিয়ে পড়োগে।

জামিল বাসায় ফিরে খাবার খেলো এবং জামা-কাপড় না খুলেই শুয়ে পড়ল। ব্রাণ্ডির বোতলকেও এক পাশে ঘুম পাড়িয়ে রাখল।

পরদিন সকাল দশটায় তার ঘুম ভাঙলো। সারা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সে ব্যথা অনুভব করলো। মাথায় যেন একটা ভারী পাথর চাপানো। মুখের ভেতর বিস্বাদজনিত তিক্ততা। উঠে গিয়ে সে দু'তিন গ্লাস ফ্রুট সল্ট, চার-পাঁচ কাপ চা খেলো। বিকেলের দিকে সে সুস্থ বোধ করলো এবং গতকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভাবতে বসলো।

সুদীর্ঘ শেকলের মত সে স্মৃতি। গ্রীন হোটেল থেকে কোলাবা পর্যন্ত সব ঘটনা মনে আছে। তারপর নেটুরের সাথে বিশেষ এলাকায় ঘুরে বেড়ানোর পর থেকে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যাচ্ছে না। কিছু কিছু স্পষ্ট, বাকি সবটা অস্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

সে কিভাবে মেয়েটির ঘরে পৌঁছালো?

জামিল তার নামও মনে রাখতে পারল না। অবশ্য মেয়েটির চেহারা ছুরত অবিকল তার মনে আছে।

মেয়েটির ঘরে সে কিভাবে পৌঁছাল? সেটা জানা খুবই প্রয়োজন। জামিলের স্মৃতি তাকে সহায়তা করলে অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে যেতো, কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারল না।

ট্যাক্সির প্রসঙ্গ। প্রথম ট্যাক্সি তো ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ট্যাক্সি কোথা থেকে এসে পড়লো?

ভেবে ভেবে জামিল হয়রাণ হয়ে গেল। সে অনুভব করলো, তার মাথায় চেপে থাকা ভারী পাথরগুলি পরস্পর সংঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

রাতের বেলায় জামিল তিন পেগ পান করলো। হালকা ধরনের খাবার খেল এবং বিগত ঘটনাবলী সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেদিনের ঘটনাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করা জামিলের একটা অভ্যাসে পরিণত হলো। সে চাচ্ছিল সবকিছু তার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাক এবং নিত্যদিনের চিন্তাক্ষয় বন্ধ হোক। তাছাড়া সেদিনের পাপ অসম্পূর্ণ রয়ে

গেছে, এজন্যও তার মনে একটা দুঃসহ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। জামিল ভাবলো, এই অসম্পূর্ণ পাপ যাবে কোন্ খাতে? সে চাচ্ছিল যে এ পাপও পূর্ণ হয়ে যাক।

কিন্তু অনেক খোঁজাখুজি করেও জামিল পাহাড়ী বাংলোর মত সেই বাড়ীর হদিস বের করতে পারল না। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে একদিন সে ভাবলো, সবকিছু স্বপ্ন ছিল না তো?

কিন্তু স্বপ্নই বা হয় কি করে? স্বপ্নের মধ্যে মানুষ তো টাকা খরচ করতে পারে না। সেদিন কমপক্ষে জামিলের আড়াইশ টাকা খরচ হয়েছিল।

পীর সাহেবের কাছে নেটুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, সেদিনের পর থেকে নেটুর সমুদ্রতীরে চলে গেছে। সমুদ্রতীরে সে মুক্তোর জন্য গেছে। জামিল তার প্রতি হাজার হাজার অভিসম্পাত দিল এবং উদ্দিষ্ট ঠিকানা নিজেই খুঁজতে লাগলো।

স্মৃতিশক্তির উপর জোর দিয়ে জামিল দেখতে পেল, সেই বাংলোর সামনে পেতলের একটা নেমপ্লেট ছিল। তাতে ডাক্তার বৈয়ামজী এবং আরো কি কি যেন লেখা ছিল।

একদিন কোলাবার কানা গলিতে হাঁটতে হাঁটতে জামিল একটা বাড়ী দেখে মনে মনে ভাবলো এ বাড়ী তো আমি চিনি। দু'পাশে অনুরূপ আরো কয়েকটি বিল্ডিং রয়েছে। সবগুলোর সামনে পেতলের নেমপ্লেট লাগানো। কোন বিল্ডিং?

জামিল এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো। সকালে শাশুড়ীর কাছ থেকে পাওয়া চিঠি তার মন এবং মগজে ছেয়ে আছে। শাশুড়ী লিখেছেন, আমাদের প্রতীক্ষার শেষ নেই। আমি তারিখ নির্ধারণ করে দিলাম, এসে তোমার বউ নিয়ে যাও।

আর এখানে সে একটা অসম্পূর্ণ পাপকে সম্পূর্ণ করার জন্য হন্যে হয়ে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। জামিল এসব কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল। হঠাৎ ডানদিকের বিল্ডিং-এর গায়ে লাগানো একটা ছোট্ট নেমপ্লেট দেখতে পেল। তাতে লেখা আছে, ডাক্তার এম. বৈয়ামজী, এম ডি.।

জামিল উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করলো। এ বিল্ডিংই তো সে খুঁজে ফিরছে। সেই রং, সেই সিঁড়ি। জামিল দ্রুতপায়ে উপরে চলে গেল। সব জিনিস তার চেনা পরিচিত। করিডোর পেরিয়ে সে সামনের দরজার কড়া নাড়লো।

একটা ছেলে দরজা খুলে দিল। এই ছেলেই সেদিন সোডা এবং বরফ এনেছিল। জামিল কৃত্রিম হাসি হেসে বলল, বাইজী আছে ?

ছেলেটি মাথা নেড়ে জানাল, হাঁ।

জামিল অসংকোচে বলল, যাও তাকে বল, সাহেব দেখা করতে এসেছেন।

ছেলেটি দরজা লাগিয়ে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে তারা এসে দাঁড়াল। মেয়েটিকে দেখেই জামিল চিনে ফেলল। বলল, নমস্তে।

মেয়েটি তার ছোট করে কাটা চুলে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, নমস্তে। বলুন, কেমন আছেন ?

জামিল জবাব দিল, ভাল আছি। গত ক'দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম, এজন্য আসতে পারিনি। বল, কি ইচ্ছে ?

তারা অকম্পিত স্বরে বলল, মাফ করবেন, আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

জামিল চমকে উঠল। বলল, বিয়ে ? কবে ?

তারা একই ভাবে বলল, জী, আজ সকালে। আসুন, আমার স্বামীর সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

জামিলের মাথা ঘুরে গেল। সে কিছু বললও না, শুনলও না। খট খট করে নীচে নেমে গেল। সামনে ট্যাক্সি দাঁড়ান। জামিলের বুক মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল। দ্রুতপায়ে সে বাজারের দিকে হাঁটতে লাগল।

জামিলকে চলে যেতে দেখে ড্রাইভার উচ্চস্বরে বলল, শেঠ সাহেব, ট্যাক্সি !

জামিল রুক্ষ স্বরে বলল, না হতভাগা, বিয়ে !

নলখাগড়ার পেছনে

শহরের নাম, আমি মনে করি আপনাদের জানা এবং আমার জানানোর কোন প্রয়োজন নেই। ব্যস, এটুকু বলাই যথেষ্ট যে এ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট স্থান পেশোয়ার জেলায় অবস্থিত। সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় নলখাগড়ার পেছনে একটা জীর্ণ কুটিরে সেই মহিলা বাস করে।

মহিলাটির কুটিরের এপাশে কাঁচা সড়ক, তার ওদিকেই ঘন নলখাগড়ার বন। সড়কের উপর দিয়ে যাতায়াতকারী পথচারীরা নলখাগড়ার বনের কারণে সে কুটির দেখতে পায় না।

নলখাগড়া সবই শুকিয়ে গেছে, কিন্তু মাটির সাথে এমন ভাবে গেঁথে আছে, দেখে মনে হয় যেন দুর্ভেদ্য দেয়াল। এসব নলখাগড়া আগে থেকে বিদ্যমান ছিল নাকি সেই মহিলা পুঁতে দিয়েছে, জানি না। তবে বলা যায় যে মহিলার ঘর সে দেয়ালের পর্দার আড়ালে অবস্থিত।

কুটির বলুন, মাটির ঘর বলুন, মোটে তিনটি ছোট ছোট কামরা। তবে খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পেছনের কামরায় একটি সুন্দর পালঙ্ক, তার পাশে একটা উঁচু স্থানে সারা রাত মৃদু আলো ছড়ানো বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়। প্রতিদিন জ্বালানো থাকলেও বাতিটি বেশ পরিষ্কার এবং প্রত্যহ তাতে নতুন করে তেল দেয়া হয়।

এবার আমি আপনাদেরকে সেই মহিলার নাম বলব—যে কিনা নিজের মেয়েকে নিয়ে নলখাগড়ার পেছনে বাস করে।

অনেক কথা শোনা যায়। কেউ বলে, সেই মেয়ে তার কন্যা সন্তান নয়। এক অপরিচিতা অনাথ বালিকাকে সে শৈশব থেকে প্রতিপালন করেছে, কেউ বলে সে তার অবৈধ সন্তান, আবার কেউ বলে এসব কিছু নয়, সেই আসলে তার বৈধ সন্তান। যা কিছুই সত্য হোক সে সম্পর্কে নিশ্চয়তার সাথে কিছু বলা সম্ভব নয়। এ কাহিনী পাঠের পর আপনারাই কোন একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন।

দেখুন, আপনাদের সেই মহিলার নাম বলতে ভুলে গেছি। আসল কথা

হলো তার নাম তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনারাই তার একটি নাম ঠিক করে নিন। ধরুন, সকিনা, মাহতাব, গুলশান বা অন্য কিছু। নামে কি আর এসে যায়। কিন্তু আপনাদের সুবিধার জন্য সেই মহিলার নাম সরদার রাখছি।

এই সরদার একজন প্রৌঢ়া মহিলা। এক সময়ে নিঃসন্দেহে সুন্দরী ছিল। তার ভাঁজ পড়া লালচে গালের প্রতি তাকালেই সেটি বোঝা যায়। তবে প্রৌঢ়া হলেও বয়সের চেয়ে তাকে বেশ কয়েক বছর ছোট বলে মনে হয়। সে যাকগে, তার গালের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

তার কন্যা বা অন্য যাই কিছু হোক না কেন—যৌবনের অত্যন্ত চমৎকার উপমা ছিল। তার চেহারা ভাবভঙ্গি দেখে কিছুতেই তাকে বাজে মেয়ে বলে মনে করা যাবে না। কিন্তু আসলে তার মা তাকে দিয়ে অসৎ কাজ করায়, এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। আর এটাও ঠিক যে, সেই মেয়ের এ পেশার প্রতি কোন ঘৃণা বোধ ছিল না। মেয়েটির নাম আপনাদের সুবিধার্থে নওয়াব রেখে দিচ্ছি। আসলে জনপদ থেকে দূরে এমন স্থানে সে প্রতিপালিত হয়েছিল যে, সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। সরদার তার সাথে পালঙ্কে যখন প্রথম পুরুষের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তখন নওয়াব ভেবেছিল মেয়েদের যৌবন সূচনা এভাবেই হয়ে থাকে। ফলে নওয়াব পতিতা জীবনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয় এবং দূর দুরান্ত থেকে আগত পুরুষদের সাথে অসংকোচে পুরনো আমলের সেই পালঙ্কে শুয়ে পড়ত। নওয়াব ভেবেছিল এটাই তার জীবনের চরম প্রাপ্তি।

এমনিতে নওয়াব সবদিক থেকেই ছিল একটা বাজে মেয়ে। আমাদের সমাজের মেয়েরা দেহপসারিণী মেয়েদের সম্পর্কে এরূপ ধারণাই পোষণ করে। কিন্তু বলতে কি এ সম্পর্কে নওয়াবের কোন অনুভূতিই ছিল না। সে মুহূর্তের জন্যও ভাবেনি যে, সে পাপ পঙ্কিল জীবন যাপন করছে। আর ভাববেই বা কি করে, এ ধরনের ভাবনার কোন সুযোগই যে পায়নি।

তার দেহে অদ্ভুত সরলতা ছিল। তার কাছে সপ্তাহ দেড় সপ্তাহ পরে আসা পুরুষদের কাছে সে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করতো।

কারণ সে মনে করতো যে, এটাই মেয়েদের কাজ। সে সব পুরুষের আশা-আকাঙ্খা এবং আরাম-আয়েশের প্রতি বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতো। পুরুষদের কোন সামান্যতম দুঃখ-কষ্টও সে সহ্য করতে পারতো না।

শহরের লোকদের চালচলন সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। সে মোটেই জানত না যে তার কাছে যেসব পুরুষ মোটরে চড়ে আসে তারা প্রতিদিন ভোরে ব্রাশ দিয়ে দাঁত সাফ করতে অভ্যস্ত এবং চোখ মেলেই বাসিমুখে বেড-টি পান করে, তারপর প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করে। কিন্তু ধীরে ধীরে নওয়াব শহুরে নাগরিকদের এসব অভ্যাস সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। সে জেনে অবাক হয়ে যায় যে, সব পুরুষ একরকমের হয় না। কেউ ভোরে উঠে সিগারেট চায়, কেউ চা চায়, আবার কেউ কেউ বিছানা ছেড়ে উঠতেই চায় না। আবার কেউ রাতভর জেগে থেকে প্রত্যুষে মোটরে আরোহণ করে পালিয়ে যায়।

সরদার ছিল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। সে ভালো করেই জানতো যে, তার কন্যা নওয়াব যত ছোটই হোক না কেন সে তার ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। এ কারণে সরদার একটা নেশাজাত বটিকা খেয়ে তক্তপোষে শুয়ে থাকতো। তবে কখনো কখনো সরদারের প্রয়োজন দেখা দিত। যখন কোন ক্রেতা অত্যধিক মদ খাওয়ার কারণে মাতলামি শুরু করে দিত, তখন সরদার নওয়াবকে বলতো যে, ওকে আচার খাইয়ে দে। অথবা, গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে খাইয়ে বমি করিয়ে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দে।

নওয়াবের কাছে যে লোকই আসতো তার কাছ থেকে সরদার আগে-ভাগেই পারিশ্রমিক আদায় করে নিজের নির্দিষ্ট কৌটায় হেফাজত করে রাখত। এ ব্যাপারে সে খুবই সচেতন থাকতো। পারিশ্রমিক আদায়ের পর ক্রেতাকে শুভ কামনা জানাতো। যেমন, তুমি আরামে দোলনায় দোলো। তারপর নেশার বটিকা সেবন করে শুয়ে থাকতো।

যে পারিশ্রমিক পাওয়া যেতো তার মালিক ছিল সরদার। কিন্তু উপহার উপঢৌকনের ব্যাপারে সে কিছু বলত না, সেগুলো নওয়াবই পেতো। নওয়াবের কাছে যেসব লোক আসতো সাধারণত তারা ছিল বিত্তশালী।

এজন্য সে দামী পোষাক পরিধান করতো এবং মিঠাই-মণ্ডা, ফল-ফলারি খেতো।

নওয়াব খুব সুখী ছিল। মাত্র তিন কামরা বিশিষ্ট সে মাটির ঘরে নওয়াব বেশ স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছিল। একজন সামরিক অফিসার তাকে গ্রামোফোন এবং বেশ কিছু রেকর্ড উপহার দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে নওয়াব সে সব রেকর্ড বাজিয়ে শুনতো এবং নিজে সে অনুযায়ী গান গাওয়ার চেষ্টা করতো।

তার কণ্ঠে কোন সুর ছিল না। কিন্তু সম্ভবত সে এ সম্পর্কে কখনো খেয়ালই করেনি। সত্যি বলতে কি তার কোন ব্যাপারেই তেমন জানা-শোনা ছিল না এবং সে জানতে চাইতো না। তাকে যে পথে নামিয়ে দেয়া হয়েছে তা সে নিজের অজ্ঞাতেই মেনে নিয়েছে।

নলখাগড়ার এদিকের পৃথিবী কেমন সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। শুধু একটা কাঁচা রাস্তাই সে বরাবর দেখে এসেছে। সে কাঁচা রাস্তা দিয়ে দু'তিন দিন পর পর একটা মোটর ধূলি উড়িয়ে এসে হর্ন দিত। নওয়াবের মা অথবা সে যেই ছিল, তখন গাড়ীর কাছে গিয়ে আরোহীকে বলত, মোটর যেন নলখাগড়া থেকে কিছু দূরে রেখে দেয়। তারপর মোটর আরোহী বাড়ীর ভেতর এসে পালঙ্কের ওপর নওয়াবের সাথে বসে মিষ্টি মিষ্টি আলাপ জমাতো।

নওয়াবের কাছে যারা আসতো তাদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। পাঁচ-ছ' জন হবে। কিন্তু এ পাঁচ-ছ' জনের জন্য সরদার এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিল যে, কারো সাথে কেউ মুখোমুখি হতো না। সরদার বড় হুশিয়ার মহিলা ছিল। প্রত্যেক ক্রেতার জন্য সে নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করে দিত। এতে কেউ অভিযোগের সুযোগ পেত না। এ ছাড়া নওয়াব যেন মা হতে না পারে সরদার যথা সময়ে সে ব্যবস্থা করে রাখতো। নওয়াব যে অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছিল তাতে তার মা হওয়া ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু সরদার দু'আড়াই বছর থেকে নওয়াবকে এ আশঙ্কা থেকে মুক্ত রাখে।

নলখাগড়ার পেছনে দু'আড়াই বছর যাবত এ কাজ নিরুদ্বেগে সম্পন্ন হচ্ছিল। পুলিশও খবর পায়নি। যারা যাওয়া আসা করতো, শুধু তারাই

জানতো।

নলখাগড়ার পেছনে, সে মাটির ঘরে একদিন আলোড়ন সৃষ্টি হলো। একটা বড় ধরনের মোটর গাড়ী, সম্ভবত ডজ ওখানে এসে থামল। হর্ন শুনে সরদার বাইরে এসে দেখে একজন অপরিচিত লোক। সে সরদারের সাথে কোন কথা বলল না, সরদারও তাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। মোটর গাড়ী দূরে দাঁড় করিয়ে লোকটি সোজা ঘরে প্রবেশ করলো, যেন এ ঘর তার চেনা—এখানে সে প্রতিদিন এসে প্রবেশ করে।

সরদার উদ্বিগ্ন বোধ করলো। কিন্তু বারান্দায় এসে নওয়াব মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে আগন্তুককে স্বাগত জানালো এবং নিজের ঘরে গেল। নওয়াব এবং আগন্তুক পাশাপাশি বসেছিল, এমন সময় সরদার কামরায় প্রবেশ করলো।

আগন্তুককে দেখেই সরদার বুঝে ফেলল যে লোকটি বিত্তশালী, দামী পোশাক পরিধানে, দেখতে সুদর্শন। সরদার আগন্তুককে সালাম জানিয়ে বলল, আপনাকে এদিকের পথের হদিস কে জানিয়েছে?

আগন্তুক হাসলো এবং নওয়াবের ফোলা তুলতুলে গাল আঙ্গুলে টিপে বলল, ও।

নওয়াব পট করে এক পাশে সরে গিয়ে বলল, হায়, তোমার সাথে তো কখনো আমার দেখাই হয়নি।

আগন্তুকের মুখে হাসি প্রসারিত হলো। সে বলল, আমি কয়েকবার তোমার সাথে সাক্ষাৎ করেছি।

নওয়াব জিজ্ঞেস করল, কবে, কোথায়? তার ছোট চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো। এতে তাকে আরো আকর্ষণীয় মনে হলো।

অপরিচিত আগন্তুক নওয়াবের মাংসল হাত মুঠোয় পুরে বলল, সেটা তুমি এখনো বুঝবে না, তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো।

নওয়াব আ আভোলা ভাবে তার মাকে জিজ্ঞেস করল সে কবে এবং কোথায় এ লোকের সাথে দেখা করেছে? সরদার বুঝে ফেলল যে তার কাছে যেসব লোক আসে তাদের কেউ বলেছে। এটা বোঝার পর সরদার নওয়াবকে বলল, আমি তোমাকে বলব'খন।

এই বলে সে বাইরে চলে গেল। তক্তপোষে বসে কৌটা থেকে আফিমের বটিকা বের করে খেয়ে শুয়ে পড়ল। মনে মনে নিশ্চিন্ত হলো যে, মানুষ ভালো, গোলমাল করবে না।

আগন্তুকের নাম আমরা যতোটা জানি হায়বত খান, বাড়ী হাজারা জেলায়। বেশ বিত্তশালী। নওয়াবের দুষ্টুমীতে এতোটা প্রভাবিত হলো যে, যাওয়ার পথে সরদারকে বলল, ভবিষ্যতে ওর কাছে অন্য কেউ যেন না আসে।

সরদার ছিল সুচতুর। মহিলা হায়বত খানকে বলল, খান সাহেব, আপনি কি এতো টাকা দিতে পারবেন যে—

হায়বত খান সরদারকে কথা শেষ করতে না দিয়ে পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে সরদারের পায়ের কাছে ছুঁড়ে মারল। তারপর নিজের আঙ্গুলের আংটি নওয়াবের আঙ্গুলে পরিয়ে নলখাগড়ার ওপারে চলে গেল।

নওয়াব টাকার প্রতি চোখ তুলেও চাইল না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের হাতের আংটি দেখতে লাগলো, যা থেকে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছিল। মোটর স্টার্ট নিল এবং ধোঁয়া-ধূলো উড়িয়ে চলে গেল। তারপর সে চমকে উঠে নলখাগড়ার কাছে এলো, কিন্তু রাস্তায় তখন ধূলো-বালি ছাড়া আর কিছু নেই।

সরদার টাকার তোড়া উঠিয়ে গুণে দেখল। আর একখানা নোট হলে পুরো দু' হাজার টাকা হতো। কিন্তু সে জন্য তার কোন দুঃখ ছিল না। সব টাকা তুলে নির্দিষ্ট স্থানে হেফাজত করে রেখে আফিমের একটা বটিকা খেয়ে সে শুয়ে পড়ল।

নওয়াব মনে মনে খুব খুশী। বার বার হীরক-সজ্জিত আঙ্গুলের প্রতি তাকাচ্ছিল। তিন-চার দিন কেটে যাবার পর আরেকজন লোক এলো। লোকটি বেশ বিত্তশালী কিন্তু সরদার জানাল যে পুলিশের হানা দেয়ার আশংকায় আমরা সে ধান্দা বন্ধ করে দিয়েছি। লোকটা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

হায়বত খান সরদারকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। সে আফিম খেয়ে

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো, যদি আমদানী এভাবে হতে থাকে তাহলে দিন-কাল অল্প দিনেই ফিরে যাবে। আর লোক যদি একজনই আসে তাতে ঝামেলা কম। এসব ভেবে সরদার সিদ্ধান্ত নিল যে, বাকি যারা আসে তাদের একে একে পুলিশের ভয়ের কথা বলে সরিয়ে দেবে। তাদের বলবে যে নিজের সম্মান বিপন্ন করতে পারি না।

এক সপ্তাহ পর হায়বত এলো, এ সময়ের মধ্যে সরদার দুজন ক্রেতাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

হায়বত প্রথম দিনের মত শান শওকতের সাথে এসে হাজির হয়েছিল। এসেই সে নওয়াবকে বুকে জড়িয়ে ধরল। হায়বত খান সরদারের সাথে কোন কথা বলল না। হায়বত নওয়াবকে কামরার পালঙ্কের উপর নিয়ে গেল। সরদার আর ভেতরে গেল না। আফিমের বটিকা খেয়ে ঝিমোতে লাগল।

হায়বত খান নওয়াবের সান্নিধ্যে আরো বেশী অভিভূত হলো। নওয়াব পেশাদার পতিতাদের বেহায়ামীপনা থেকে ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। তার মধ্যে সাধারণ ঘরোয়া মেয়েদের ছাপ নেই, তবে তার মধ্যে যা রয়েছে তা তার একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। শিশু যেমন মায়ের কোলে শুয়ে থাকে নওয়াব ঠিক তেমনি হায়বত খানের সাথে মিশে শুয়ে থাকতো। হায়বত খান নওয়াবের বুক আদর করতো, তার নাকে এবং চুলে আদর করতো তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়তো।

হায়বত খানের জন্য নওয়াব ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা। মেয়েদের এ রকম মোহন বৈশিষ্ট্য তার মনে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিত। এরপর থেকে সে নওয়াবের কাছে সপ্তাহে দুবার করে আসতো। নওয়াব তার জন্য অসাধারণ আকর্ষণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরদারের নোট সঞ্চয় আগের চেয়ে অনেক বেশী হওয়ায় সে মনে মনে খুব খুশী হলো। নওয়াব তার সহজাত দুষ্টুমী সত্বেও মাঝে মাঝে ভাবে যে হায়বত খান এমন ভয়ে ভয়ে থাকে কেন? নলখাগড়ার এপাশে কাঁচা রাস্তায় যদি কোন লরী বা মোটরের শব্দ শোনা যায় তাহলে সে ভয়ে এতটুকু হয়ে যায় কেন? তার কাছ থেকে দূরে সরে যায় কেন? আর চুপে

চুপে দেখে কেউ এসেছে কি না।

একদিন রাত বারোটার দিকে রাস্তার উপর দিয়ে একটি লরী যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। নওয়াব এবং হায়বত খান ঘনিষ্ঠভাবে শুয়েছিল। হঠাৎ হায়বত খান কেঁপে উঠে একপাশে সরে গেল। নওয়াবের ঘুম ছিল খুবই হালকা। সে ভয়ে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার করে হায়বত খানকে বলল, কি হয়েছে?

হায়বত খান তৎক্ষণে নওয়াবকে বলল, না না, কিছু না। সম্ভবত আমি স্বপ্নের মধ্যে ভয় পেয়ে গেছি।

রাতের নীরবতায় দূর থেকে তখনো লরীর আওয়াজ ভেসে আসছিলো।

নওয়াব হায়বত খানকে বলল, না খান, অন্য কিছু হয়েছে। যখনি কোন মোটর বা লরী রাস্তার উপর দিয়ে যায় তখনি তুমি অমন করো কেন?

সম্ভবত হায়বত খানের সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক স্থানে নওয়াব হাত দিয়েছে। নিজের পৌরুষ বজায় রাখবার জন্য সে তাড়াতাড়ি ধমকের সুরে বলল, কি যা তা বলছ, মোটর এবং লরীকে ভয় পাবার কি কারণ থাকতে পারে?

নওয়াবের মন ছিল খুবই লাজুক। হায়বত খানের ধমকে সে মনে ব্যথা পেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। হায়বত খান নওয়াবকে ধীরে ধীরে চুপ করিয়ে আরো বেশী করে আদর করতে শুরু করল।

হায়বত খান বেঁটে খাটো দেহের অধিকারী স্বাস্থ্যবান পুরুষ। নওয়াবকে হায়বত খান ভালবাসার উষ্ণতা প্রদান করেছে, দৈহিক তৃপ্তি সম্পর্কে অবহিত করেছে। ফলে নওয়াব হায়বত খানকে ভালবাসতে শুরু করেছে। হায়বত খান এক সপ্তাহ না এলে নওয়াব রেকর্ড প্লেয়ারে বিরহের গান বাজায়। নিজেও সে গানে কণ্ঠ মিলায়। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে।

কয়েক মাস কেটে গেল, নওয়াব মানসিক দিক থেকে হায়বত খানকে পুরোপুরি আপন করে নিয়েছে। কিন্তু হায়বত খান এখন কয়েক ঘন্টার জন্য আসে এবং তাড়াতাড়ি চলে যায়। এসব দেখে নওয়াবের উদ্বেগ বেড়ে যায়। নওয়াব এও বুঝতে পারে যে, তার সাথে বেশী করে সময়

কাটাতে চেয়েও হায়বত খান পারে না। কেন জানি সে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

এ সম্পর্কে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেও নওয়াব সদুত্তর পায়নি। হায়বত খান এড়িয়ে গেছে।

একদিন খুব ভোরে ডজ গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। নওয়াব চোখ কচলাতে কচলাতে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখে হায়বত খান এসেছে। নওয়াব তাকে জড়িয়ে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

দীর্ঘক্ষণ উভয়ে প্রেম-ভালবাসার আলাপ করল। নওয়াবের মনে কি হলো কে জানে, সে হঠাৎ বলল, খান, আমাকে সোনার চুরি এনে দাও।

হায়বত খান নওয়াবকে চুমু খেয়ে বলল, কালই নিয়ে আসব। তোমার জন্য তো আমার জীবনই হাজির রয়েছে।

নওয়াব একটি মোহন ভঙ্গি করে বলল যেতে দাও খান সাহেব— জীবন তো আমাকে দিতে হবে।

হায়বত খান মনে মনে বিগলিত হয়ে গেল। নওয়াবের সাথে অত্যন্ত আনন্দ ঘন পরিবেশে সময় কাটিয়ে পরদিন সোনার কাঁকন নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হায়বত খান বিদায় নিয়ে চলে গেল। বলে গেল, সোনার কাঁকন আমি তোমাকে নিজের হাতে পরাবো।

পরদিন নওয়াবের খুশীর সীমা রইল না। সে ভাবল আজ হায়বত খান—তার প্রেমিক তার জন্য সোনার কাঁকন নিয়ে আসবে। নিজ হাতে তাকে পরিয়ে দেবে। সারাদিন প্রতীক্ষা করেও লাভ হলো না। হায়বত খান এলো না। নওয়াব ভাবল, সম্ভবত মোটর গাড়ী খারাপ হয়ে গেছে। রাতে আসবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সারারাত অনিদ্রায় কাটিয়েও নওয়াব হায়বত খানের দেখা পেল না। তার খুব দুঃখ হলো। সে তার মাকে, অথবা সে যা-ই হোক, সে বলল, দেখ, খান কথা দিয়েও এলো না। আবার ভাবলো, হয়তো কিছু হয়ে গেছে। এই ভেবে সে আতঙ্কে এতটুকু হয়ে গেল।

নওয়াবের মাথায় কয়েকটি দুশ্চিন্তা আসতো। মোটর দুর্ঘটনা, আকস্মিক অসুখ, কোন ডাকাতের হানা। কিন্তু আবার মোটরের শব্দে

হায়বত খানের ভয় পাওয়ার কথাও সে ভাবতো। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারত না।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। এ সময়ে নওয়াবের পুরনো ক্রেতারাও কেউ এলো না কারণ সরদার তাদের নিষেধ করে দিয়েছে। কাঁচা রাস্তা দিয়ে কয়েকটি লরী ধুলো উড়িয়ে চলে গেছে। নওয়াবের ইচ্ছে হতো ওসব লরীর পেছনে ছুটে গিয়ে তাদের আগুন ধরিয়ে দেয়। কারণ এদের জন্যই হায়বত খান তার কাছে আসতে পারে না। আবার ভাবে তা হবে কেন? লরী বা মোটর কি কোন বাধা হতে পারে? নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে সে হাসতো।

তবে হায়বত খানের মত বলিষ্ঠ পুরুষ মোটর গাড়ীর শব্দকে কেন ভয় পায়, এটা নওয়াব কিছুতেই বুঝতে পারত না। তার মাথায় যে সব কারণ যুক্তি হিসেবে এসে হাজির হতো তাতে সে নিজেকে প্রবোধ দিতে পারত না। ফলে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে সে রেকর্ড প্লেয়ারে বিরহের গান বাজিয়ে শুনতো, এতে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠতো।

এক সপ্তাহ পরে একদিন দুপুর বেলা নওয়াব এবং সরদার খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের কথা ভাবছিল, হঠাৎ বাইরের কাঁচা রাস্তায় মোটর গাড়ীর হর্ন শোনা গেল। উভয়ে সে হর্ন শুনে চমকে উঠলো, কারণ এ হর্ন হায়বত খানের গাড়ীর হর্ন নয়। সরদার বাইরে গিয়ে কে এসেছে দেখছিল কিন্তু দেখে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে দেখল একটা নতুন মোটরে হায়বত খান বসে আছে। পেছনের আসনে একজন আধুনিক সুদর্শনা যুবতী।

হায়বত খান কিছু দূরে মোটর গাড়ী থামিয়ে নেমে এল। তার সঙ্গের যুবতীও নেমে এল। সরদার ভাবল এ কি আজব ব্যাপার। নারী সঙ্গ লাভের জন্যই তো হায়বত খান এখানে আসে, তাহলে অমন দামী পোষাক পরিহিতা সুদর্শনা যুবতী মেয়ে হায়বত খানের সঙ্গে এলো কেন?

সরদার এসব ভাবছিল আর হায়বত খান নওয়াবের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সরদার দেখল মহিলার গায়ে সোনার অলংকারও রয়েছে। সরদারের প্রতি তাদের দুজনের কেউই ভ্রূক্ষেপ করল না।

নওয়াবের কামরায় খাওয়ার পর নওয়াব সেই যুবতী মেয়ে এবং হায়বত খান কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। অদ্ভুত সে নীরবতা। তবে যুবতী মেয়েটিকে কিছুটা অস্থির দেখাচ্ছিল, তার একটি পা দ্রুত দুলছিল।

এ সময় সরদার এসে বারান্দায় দাঁড়াল এবং হায়বত খানকে সালাম করল। হায়বত খান কোন জবাব দিল না। আসলে সে ভীষণ নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল।

যুবতী মেয়েটি পা দুলানো বন্ধ করে সরদারকে বলল, আমরা এসেছি, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করো। সরদার আন্তরিকতার সুরে বলল, তোমরা যা বলবে, এক্ষুণি তৈরী হয়ে যাবে।

মেয়েটিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখলেই বোঝা যায় তার ভাবভঙ্গি সন্দেহ-জনক এবং বড় ধুরন্ধর মেয়ে। সরদারকে সে বলল, তুমি বাবুর্চিখানায় যাও, চুলো ধরাও। বড় ডেকচি আঁছে তোমার ঘরে?

সরদার তার ভারি মাথা নেড়ে বলল, হাঁ, আছে।

যুবতী বলল, তবে যাও ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নাও, আমি এক্ষুণি আসছি। এই বলে যুবতী গ্রামোফোন দেখতে লাগল।

সরদার অক্ষমতা প্রকাশের সুরে বলল, গোশত টোশত তো এখানে পাওয়া যাবে না।

যুবতী মেয়েটি একটি রেকর্ড চালু করতে করতে বলল, পাওয়া যাবে। আমি যা বলছি তাই করো। আর হাঁ, দেখবে আগুন যেন গনগনে হয়।

সরদার রান্নাঘরে চলে গেল। যুবতী মেয়েটি হাসিমুখে নওয়াবকে বলল, নওয়াব, আমি তোমার জন্য সোনার কাঁকন নিয়ে এসেছি।

এই বলে সে নিজের ছোট ব্যাগ খুলে অত্যন্ত সুন্দর এবং ভারী একজোড়া সোনার কাঁকন বের করল। কাঁকনগুলো অত্যন্ত পাতলা কাগজে জড়ানো।

নওয়াব তার পাশে বসে থাকা হায়বত খানকে দেখছিল। সোনার কাঁকনের কথা শুনে যুবতীর প্রতি তাকিয়ে খানকে বলল, খান, উনি কে?

যুবতী সোনার কাঁকন দোলাতে দোলাতে বলল, আমি কে? আমি হায়বত খানের বোন। এই বলে সে হায়বত খানের প্রতি তাকাল।

লক্ষ্য করল যে, তার জবাব শুনে হায়বত খান গলে মোম হয়ে গেছে। তারপর যুবতী নওয়াবের দিকে ফিরে বলল, আমার নাম হালাকত।

নওয়াব কিছু বুঝতে পারল না। যুবতীর চোখের দিকে সে তাকাতে পারছিল না। সে নিঃসন্দেহে সুদর্শনা, কিন্তু তার চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

যুবতী নওয়াবের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাতে কাঁকন পরাতে উদ্যত হলো। নওয়াব ভয়ে আতংকে জড়সড় হয়ে পড়েছে। হঠাৎ যুবতী নওয়াবের হাত ছেড়ে দিয়ে হায়বত খানকে বলল, তুমি বাইরে যাও হায়বত খান, আমি ওকে ভাল করে সাজিয়ে বানিয়ে তোমার খেদমতে পেশ করতে চাই।

হায়বত খান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। সে উঠছে না দেখে যুবতী ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, যাও, তুমি শুনতে পাচ্ছ না?

হায়বত খান নওয়াবের প্রতি তাকাল এবং বাইরে চলে গেল। তাকেও খুব অস্থির দেখাচ্ছিল, কিন্তু সে ভেবে পেল না যে, কোথায় যাবে, কি করবে।

বড় ঘরের বাইরে একটি ছোট কামরার মত ঘরের দেয়াল চট দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে। সেটা হেঁশেল। কাছে গিয়ে হায়বত খান দেখল, সরদার চুলো ধরাচ্ছে। হায়বত খান সরদারের সাথে কোন কথা বলল না, নলখাগড়ার ওপাশে রাস্তায় চলে গেল। তার তখন অর্ধোন্মাদের মত অবস্থা। একটুখানি পদশব্দেই চমকে ওঠে।

দূরে থেকে কোন লরী আসতে দেখে হায়বত খানের ইচ্ছে হয় সেটি থামিয়ে উঠে বসে এবং দূরে কোথাও চলে যায়। কিন্তু কাছে আসতেই অত্যধিক ধূলো উড়িয়ে লরী দ্রুতবেগে ছুটে চলে যায়। হায়বত খানের কণ্ঠনালী যেন শুকিয়ে আসে। জোরে শব্দ করে লরী থামাতে পারে না।

একটা লরী চলে যাওয়ার পর হায়বত খান ভাবলো নওয়াবের কামরায় যাবে, যে কামরায় নওয়াবের সাথে তার জীবনের অত্যন্ত মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কিন্তু তার পা উঠলো না, সে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কাঁচা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হায়বত খান ভাবনার রাজ্যে হারিয়ে গেল।

তার সাথে যে যুবতী এসেছে সে যুবতীর সাথে তার অনেক দিনের সম্পর্ক রয়েছে। মেয়েটির স্বামী ছিল হায়বত খানের বন্ধু। একত্রে উভয়ে বড় হয়েছে। তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোক প্রকাশের জন্য হায়বত খান তার বাসায় গিয়েছিল। তার স্ত্রীকে সে সৌজন্যমূলক সান্ত্বনার কথাও শুনিয়েছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে এই সমবেদনা উভয়ের সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। স্বামীর মৃত্যুর পরদিনই দেখা গেল যে হায়বত মেয়েটির সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। মেয়েটি তাকে এমন আদেশের সুরে ভেতরে ডেকে নিল এবং আত্মসমর্পণ করল যেন হায়বত খান তার ভৃত্য।

মেয়েদের ব্যাপারে হায়বত খান ছিল একেবারে আনাড়ি। শাহিনা অদ্ভুত আদেশের সুরে যখন তার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করল তখন সে অভিভূত হয়ে গেল। শাহিনার টাকা-পয়সার কোন অভাব ছিল না। শাহিনার নিজের এবং তার স্বামীর প্রচুর অর্থ তার কাছে রয়েছে। কিন্তু এসব অর্থের প্রতি হায়বত খানের কোন মোহ ছিল না। শাহিনা ছিল তার জীবনের প্রথম নারী, এটাই ছিল শাহিনার প্রতি আকর্ষণের প্রধান কারণ। নিজের আনাড়িপনার কারণেই সম্ভবত সে শাহিনার আদেশ অমান্য করতে পারেনি।

দীর্ঘ সময় সে কাঁচা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নানা কথা ভাবলো, অবশেষে আর থাকতে পারল না। চটের পর্দা ঘেরা হেঁশেলের কাছে গিয়ে দেখল সরদার কি যেন ভাজা করছে, নওয়াবের কামরার কাছে গিয়ে দেখল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, সে ধীরে ধীরে করাঘাত করল।

কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে গেল। কাঁচা মেঝেতে শুধু রক্ত আর রক্ত। হায়বত খান কেঁপে উঠল। সে শাহিনার প্রতি তাকালো। শাহিনা দরজার সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শাহিনা হায়বত খানকে বলল, আমি তোমার নওয়াবকে সাজিয়ে দিয়েছি।

হায়বত খান শুষ্ককণ্ঠ ঢোক গিলে ভিজিয়ে বলল, কোথায়?

শাহিনা জবাব দিল, কিছু এ পালংকের উপর রয়েছে, তবে উৎকৃষ্ট অংশগুলো রান্নাঘরে।

হায়বত খান তখনো ঠিক বুঝতে পারল না। সে কিছু বলতে পারল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ভাল করে তাকিয়ে দেখল বিছানায় গোশতের ছোট ছোট টুকরো এবং এক পাশে একটা রক্তাক্ত ছুরি পড়ে আছে।

শাহিনা হেসে বলল, তোমার সুসজ্জিতা নওয়াবকে চাদর তুলে দেখাব? আমি নিজের হাতে সাজিয়েছি! তবে তুমি আগে খেয়ে নাও। খুব খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। সরদার বড় সুস্বাদু মাংস রান্না করেছে। সে মাংসের টুকরো আমি নিজ হাতে কুটেছি।

হায়বত খানের সারা দেহ থর থর করে কেঁপে উঠল। চীৎকার করে বলল, শাহিনা, এ তুমি কি করেছ?

শাহিনা হেসে বলল, প্রিয়তম, এটা প্রথম নয় দ্বিতীয়। আমার স্বামী খোদা তাকে বেহেশত নসীব করুন, তোমার মতই অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক ছিল। আমি তাকে নিজ হাতে খুন করেছি এবং তার মাংস রান্না করে কুকুরকে খাইয়েছি। তোমাকে আমি ভালবাসি, এজন্য তোমার বদলে···।

কথা শেষ হওয়ার আগেই শাহিনা পালঙ্কে বিছানো চাদর একটানে সরিয়ে ফেলল। হায়বত খানের চীৎকার তার কণ্ঠনালিতেই আটকে রইল। সে সংজ্ঞাহীন হয়ে ঢলে পড়ল।

জ্ঞান ফিরে এলে হায়বত খান দেখল, শাহিনা গাড়ী চালাচ্ছে। গাড়ী নলখাগড়ার বিল অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে।

॥ সমাপ্ত ॥